কাকাবাবুর কাণ্ড

॥ প্রাইজ ও স্কুল লাইব্রেরীর উপযোগী হাসির গল্পমেলা ॥

কাকা বাবুর কাণ্ড

[ছোট-বড় সকলের জন্য অফুরন্ত হাসির অ্যাটমবোম]

॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥

—পরিবেশক—

সিটি বুক এজেন্সী

৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০০[illegible]

● নূতন প্রকাশ

● প্রকাশক :
পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯।

● মুদ্রণে :
শ্রীফাল্গুনী পাল
বাণীমালা প্রেস
৫৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৯।

মূল্য : নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

—উৎসর্গ—

আমার ক্ষুদে পাঠকদের উদ্দেশ্যে—

—শিবরাম চক্রবর্তী

ঃ এ[illegible]ছে ঃ

কা[illegible] কাণ্ড

ডিটেক্‌টিভ শ্রীভর্তৃহরি

রাজা হবার সোজা রাস্তা

জলযোগে প্রাণান্ত

মটর চালে মাত

কনের অনেক কোণ

অদ্‌ভৌতিক

আমার অচেনা বন্ধু

কোন খেলাই সহজ নয়

বিনি প্রত্যয়

রেডিয়ো সর্বদাই রেডি

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

দু' নম্বরের কাকা

সকালে উঠেই কী একটা কাজে কাকাবাবু বেরিয়েছিলেন, বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

ড্রইংরুমে ঢুকেই, সলিলকে পেলেন সামনে। কুশন্‌চেয়ারে এলিয়ে গল্পের বইয়ের মধ্যে সে তখন ডুবেছিল, কাকাবাবুর পদশব্দে সচকিত হয়ে ভেসে উঠল সেই মুহূর্তেই।

"এই যে সলিল! কাকাতুয়ার কথাটা মনে ছিল?"

সলিল ঘাড় নাড়ল—"হ্যাঁ।"

ভাইদের মধ্যে সলিলই সবচেয়ে ভোরে ওঠে, কাকাবাবু তাই বেরুবার আগে, কাকাতুয়ার কথাটা মনে ক'রে রাখবার জন্যে তাকেই পই পই ক'রে ব'লে গেছলেন।

"বাঃ, বাঃ বেশ, বেশ! এইত চাই!—" এই ব'লে কাকাবাবু সহাস্য-বদনে পেল্লায় এক চকোলেট বের করলেন পকেট থেকে। কাড্‌বারির বারো আনা দামেরই হবে হয়তো! তারপরে চকচকে কাগজের খোলা ছাড়িয়ে, সন্তর্পণে, তার থেকে একটুখানি গালে ফেলে,—সলিলের নয়, নিজের গালে ফেলে—অবশেষে সবটাই তিনি সলিলের হাতে সমর্পণ করলেন।

"নে একাই তুই খা! প্রণব, শ্যামল, আলো কাউকে তোর দিতে হবে না। মিথ্যে কথার এক এক কাঁড়ি ওরা। সবাই হোনড্রু ফল্‌স্। কোনো কাজের না! তুই যে, আমার কথাটা রেখেছিস এতেই আমি—কী আর বলব? ভয়ঙ্কর—ভয়ানক রকম বাধিত।

যেসব ছেলেরা মন দিয়ে কথা শোনে সেই সব সোনা ছেলেদের আমি বড্ড ভালোবাসি।

এক গাল হাসির সঙ্গে তাঁর এক গাদা ভূয়সী প্রশংসা বেরয়। "হ্যাঁ, ভালো কথা! জল দিয়েছিলি তো ভুশুণ্ডীকে?" কাকাবাবুর মনে পড়ে যায় হঠাৎ।—"ভারি ওদের জলচেষ্টা পায় কিনা! ভারি জল খায় কাকাতুয়ারা। এককেটা যা জলখোর—যেন গোবি মরুভূমি —সাহারা ডেজার্ট।"

"না তো!" সলিল বলে। অম্লান বদনেই বলে।

"জল দিস্‌নি? কী সর্বনাশ?—" ভয়ানক উদ্বিগ্ন প্রকাশ পায় তাঁর মুখে-চোখে: "ছোলা দিয়েছিলি তো? কবার দিয়েছিলি?"

"ছোলা? না তো। একবারও না।" এই বলে' সে চকোলেটের একটা তাল আলগোছে মুখের মধ্যে ফ্যালে।

"খাবার টাবার কিচ্ছু দিস্‌নি ওকে?" উৎকণ্ঠায় কাকাবাবু প্রায় কণ্ঠাগত।

"খাবার আর দিলাম কখন।" নিরুদ্বেগেই বলে সলিল। চর্বিত-চর্বনের সাথে সাথে।

"তবে কাকাতুয়ার কথা কি ছাই মনে রেখেছ তুমি?"

কাকাবাবু রাগে প্রায় ফাটেন আর কি! "মিথ্যেবাদী! জাহান্নাম! য়্যাবিসিনিয়া কোথাকার!

"মিথ্যেবাদী কেন?" সলিলের স্বরে প্রতিবাদের সুর; য়্যাবি-সিনিয়া বা জাহান্নাম বলার জন্যে ততটা নয়, যতটা এই অযথা দোষারোপের জন্যেই ভারী বিক্ষুব্ধ হয় সে।

"আলবৎ মিথ্যেবাদী!" মিথ্যেবাদী এবং বোরাবুদর্! এবং বুড়ো বাঁদর।—" রাগ হয়ে গেলে কাকাবাবুর মুখ দিয়ে যা তা সব বেরুতে থাকে—যা তাঁর মনে আসে, তাই অনায়াসে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়: "কাকাতুয়ার কথা মনে রেখেচ তুমি! মনে রেখেচই বটে!"

"বাঃ! মনেই তো রেখেচি কথাটা! মনেই রেখেচি কেবল।"

সলিলের প্রাঞ্জলতায় কাকাবাবুর প্রাণ জল হয় না, বলাই বাহুল্য।

"আহা, মাথা কিনে নিয়েছ আর কি! প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিয়েছো আমার! কী আমার হনলুলুরে!"

রাগের মুখে কথ্য অকথ্য কোনো কথাই আটকায় না কাকাবাবুর। এমনকি বঙ্গভাষার বরদাস্তের সীমাও সহজেই তিনি বরখাস্ত করে যানঃ

"সাণ্ডোমিংগো! সত্যমূর্তি! ব্রাজিল কোথাকার।—" ইতিহাস এবং ভূগোলের বহির্ভূত (কিম্বা অন্তর্গত হওয়াও সম্ভব) যত গাল আর অগাল, শোভাযাত্রা করে তাঁর ভেতর থেকে বেরুতে থাকে, ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়ে চলেঃ

"হোনড্রুরাস—মিসিসিপি—সিন্ক্রি ফ্যাক্টরি!" বলে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—"নিকারাগুয়া! নিকালো হিঁয়াসে।"

"বারে, আমি কী করলুম?"

"—কী করলুম? নোভাস্কাটিয়া! উলুবেড়ে! হিপোপটেমাস্? ঘটোৎকচ! হেইল সালাশী! পুরুরবা! অরোরা বোয়ালিস্—!"

সোরগোল তুলে, পতাকা উড়িয়ে, গাদাগাদি, গা-ঘেঁষে তারা চলে। দেশকালের সীমা তছ্ নছ্ করে যায়। ইন্টার ন্যাশন্যল ব্রিগেড —কিছুতেই তাদের থামানো যায় না।

সলিল শোনে। উৎফুল্ল মুখে শোনে সব। আর একটু একটু করে চকোলেট চাখে। সম্বোধনের সমারোহের সঙ্গে আরো যেন মিষ্টিই লাগে তার।

"যাঃ! আর চকোলেট খায় না! দৌলতপুর একাডেমি!— "

চকোলেটের একটুখানিই সে নিজের তালুতে পাঠাতে পেরেছিল— বড়ো তালটাই হাতে ছিল তার—তখনো সাবাড় করতে পারেনি। কাকাবাবু আকস্মিক এক ঝটকায় সেটা হাতিয়ে নেন। ওকে সতর্ক হবার সুযোগটুকুও না দিয়ে।

খাবে কি, হাঁ করবারই ফুরসৎ পায় না সলিল। তারপরে, চকোলেট হারিয়ে হাঁ ক'রে থাকে।

॥ ৩ ॥

"চকোলেট খাবেন! সার জং বাহাদুর আমার! বাইটন-কাপ-জেতা ঝানসী হীরোজ এসেছেন!"

এই ব'লে চকোলেটের বাকী অংশ নিজের মুখের মধ্যে তৎক্ষণাৎ তিনি পাঠিয়ে ছ্যান। তারপরে, মুখ এবং পা সবেগে চালিয়ে, সতেজে তিনি চলে যান সেখান থেকে।

চকোলেটের প্রবেশ সত্বেও, তাঁর মুখের বিকার কিছুমাত্র কমতে দেখা যায় না, সেইটাই আরো আশ্চর্য ঠ্যাকে সলিলের।

"ঘাষ-বিচালি! গোবর-গাদা! এঁঠো শ্লিপার! ছ্যা! ছ্যা!—"

ইত্যাদি বকতে বকতে তিনি অন্তর্হিত হন। শেষের বিশেষণগুলি, চকোলেট বা তার নিজের সম্বন্ধে, কার প্রতি যে তিনি প্রয়োগ করে' যান সলিল ঠিক ভেবে পায় না। আর যাই হোক, কাড্‌বারির চকোলেটকে, তার নিজের মত অখাদ্য - না, তা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না।

কাকাবাবুর প্রস্থানের পর, সলিল আবার ডুব ছ্যায় তার কুশান-এ — বইয়ের মধ্যে।

"কাকাতুয়া, না, হাতী!"

সলিল-সমাধির পর, শুধু এইটুকু তার বুদ্‌বুদ ধ্বনি বেরিয়ে আসতে শোনা যায়।

অবশ্যি, এই ঔদাসিন্য একদিনের না। প্রথম যেদিন তাদের বাড়ী, ঝুঁটিবাঁধা ল্যাজের ঝালর ঝোলানো, ঐ রঙচঙে পাখীটির আবির্ভাব হয়েছিল সেদিন তাদের মোটেই এ রকম বিমুখতা ছিল না। বরং, সত্যি কথা বলতে গেলে, সেদিন তাদের উৎসাহ আতিশয্যের চূড়ান্ত-সীমাই স্পর্শ করেছিল। এবং সলিলের ফুর্তিই হয়েছিল সবার বেশী।

হ্যাঁ, সলিলই। সলিলই সবচেয়ে বেশী। এই অপূর্ব পাখীটিকে প্রথম-দর্শনেই সে ভালবেসে ফেলেছিল। শ্যামল, প্রণব, আলো, সবার চেয়ে

তার প্রশংসাবাণীই বেশী উন্মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিন—তার গলাবাজিই টেক্কা মেরেছিল সবাইকে।

এবং আজ যে তাদের বৈরাগ্য এই পর্বতপ্রমাণে এসে দাঁড়িয়েছে তারও একটা কারণ আছে বই কি। এই অলক্ষুণে পাখীটা কেবল কাকাবাবুর স্নেহেই তাদের বঞ্চিত করেনি—তাহলেও খুব বেশী দুঃখ ছিল না! যদিও সে এ-বাড়ীতে পদার্পণ করা মাত্রই কাকাবাবুর চোখের মণি, আসা অবধি তাঁর ভালোবাসা ভোগ-দখল করছে, কাকাবাবুর ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা, তবু সেজন্যে তাদের ঈর্ষা ছিলনা। কেননা, কাকাবাবুর বিরল স্নেহের খুদ্‌কুঁড়া পাখীটা একাই চেটেপুটে নিঃশেষ করলেও, কাকীমার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে মাথা গলাতে পারেনি সে। পাখীটা কাকীমার দুচোখের বিষ। কাকাবাবুর পছন্দ আর কাকীমার রুষ্ট ছন্দ—যেন সমান তালেই বেড়ে উঠেচে। তাতেই তাদের আফসোস গেছে সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে তাতেই। কাকীমাকে একচেটে করেই কাকাবাবুর দুঃখ তারা ভুলতে পেরেছে—পাখীটার সঙ্গে একচোটে। নাকের বদলে নরুন্ পেলেই কোন্ মানুষ না খুশী হয়? এঁদো পুকুরের পানার বদলে মিছরির পানা পায় যদি? পানের স্থলে পান্তুয়া মেলে?

কিন্তু সেই তো কথা নয়, কথা আছে আরো। পাখীটা কেবল তাদের জীবনেই বিপর্যয় আনেনি, তাদের এক প্রিয়তম ব্যক্তির প্রাণ নিয়ে টানাটানির কারণ হ'য়ে উঠেচে। তার আবির্ভাবের এই ক' দিনের মধ্যেই। সেইটাই হয়েচে সবচেয়ে বেশী ভাবনার ব্যাপার।

তাদের এই প্রিয়তম ব্যক্তিটি—আর কেউ না, একটি কাবুলি বেড়াল।

বেড়ালই বটে, কিন্তু বেড়াল বললে তার অপমান হয়, কাবুলি-আখ্যাতেও তার মর্যাদা তেমন বাড়েনা, তার রূপ-গুণ, হাব-ভাব চাল্-চলন, সব কিছুর চমৎকারিত্ব খতিয়ে, চুলচেরা ভাবে বিচার করলে, সামান্য

চতুষ্পদের মধ্যে তাকে গণ্য করতে—কিম্বা নগণ্য করতে—প্রাণে লাগে সত্যিই।

বাস্তবিক, পৃথিবীতে এহেন প্রাণী দুর্লভ! মানুষের মধ্যে এমন বেড়াল পাওয়াই যায় না! বেড়ালের মধ্যে মানুষের মত। এ-বিষয়ে শ্যামল, প্রণব, সলিল, আলোর মধ্যে কোনো মতদ্বৈত নেই। তাদের পাড়ার বন্ধুদের—সেই বন্ধুদের বোনদের পর্যন্ত মতের গরমিল দেখা যায় নি। এমন কি, কাকীমাও তাদের সঙ্গে একমত। বেড়াল নিজে যে এ-বিষয়ে ভিন্ন কিছু ধারণা পোষণ করে, এমন কোন আভাস মেলেনি। ঘুণাক্ষরেও না।

কাকাতুয়ার মতটা জানা যায়নি অবিশ্যি, জানা সহজও নয়, কিন্তু কাকাবাবুর মত সবার বিপক্ষে একেবারে। অবিলম্বে, অযথা কালহরণ না করে এক্ষুণিই, যাবজ্জীবনের জন্য ওটাকে নির্বাসনে উনি পাঠাতে চান। একই বাড়ীতে বেড়ালের উপস্থিতি পাখীর পক্ষে নাকি সুবিধের নয়,— এমন কি, বিশেষরকম মারাত্মকই, শাস্ত্রেই নাকি বলেছে, এর বহুবিধ দৃষ্টান্ত নিজের চোখেও তিনি দেখেছেন, তার অতিরিক্ত, আরেকটা উদাহরণ অধিকন্তু দেখতে, কেবল যে তিনি অনিচ্ছুক তা নন, একান্ত অপারগ।

অতএব, আজই হোক আর কালই হোক, আজ হলে কাল নয়, কাবুলিকে চিরনির্বাসনে যেতেই হবে। স্বদেশে—তার কাবুলেই·· যেতে হয় কি না কে জানে!

এই আসন্ন সমস্যাটাই সলিলদের বৈরাগ্যের অতল গর্ভে ঠেলে দিয়েছিল।

কিন্তু কাকাতুয়া প্রথম-দিনের সম্বর্দ্ধনাটাও তো ভুলবার নয় তাই বলে'।

শ্যামল-প্রণবরা ড্রইংরুমে বসে' পড়াশুনার ভাণ করে' গুলতানি পাকাচ্ছিলো—কদিন আগে আর? এমন সময়ে কাকাতুয়ার দাঁড় হাতে ধরে' কাকাবাবুর প্রবেশ হোলো।

এবং কাকাতুয়ার গুরুগম্ভীর হাবভাব দেখে মনে হোলো, সে-ই যেন স্বয়ং কাকাবাবুর হাল ধরে' রয়েছে। অন্ততঃ, দুজনের মধ্যে কার গুরুত্ব বেশী, কে যে কার কর্ণধার, নির্ণয় করা দুষ্কর।

কাকাবাবুর তো ঘরে ঢুকেই, কোথায় পাখীটাকে দাঁড় করাবেন—অর্থাৎ, তার দাঁড় খাটাবেন—তাই নিয়েই শশব্যস্ত হলেন। প্রথম নম্বরেই, শ্যামলদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের সূত্রপাতেই দমিয়ে দিলেন তাদের ঃ

"থাম্! ভিড় ক'রে দাঁড়াসনে। পাখীটার আবহাওয়া কলুষিত হবে। এসব পাখী ভারী সেনসিটিভ্—একটুতেই দূষিত হয়ে পড়ে।" তিনি আগে থেকেই তাদের সাবধান ক'রে দ্যান ঃ "আর তা ছাড়া—চাই কি—কাছে পেলে ঠুকরেও দিতে পারে। বলা যায় কি?"

পাখীটার ক্ষতির আশঙ্কায় ততটা না, যতটা নিজেদের বিক্ষতির ভয়েই তারা পিছিয়ে গেছে অকস্মাৎ।

কিন্তু কতক্ষণ আর? আলো আবার অদম্য হয়ে উঠেছে ঃ দেখেছিস, কত বড়ো টিয়া পাখী? বাবা কত বড়ো!" পক্ষীতত্ত্বে তার অভিজ্ঞতা প্রকাশ না ক'রে পারে নি সে।

টিয়া না টিউনিসিয়া! ব্লাডিভাস্টক্ কোথাকার!" বেশ একটু ক্ষিপ্ত হয়েই মন্তব্য করেছেন কাকাবাবু।

"টিয়াপাখী কতো সংক্ষিপ্ত! তাকে আর এত বড়ো হতে হয় না! ময়নাকেও না। তোর মুসোলিনি কিংবা মসলিপট্টনকেও নয়।

"টিয়াপাখী না তো কি আবার! আমি বুঝি আর টিয়াপাখী দেখিনি কখনো?" আলোও নিজের গোঁ ছাড়ে না সহজে ঃ "একটা বুড়ো টিয়াপাখী এনেছো! একটু বেশী বয়স্ক দেখে, এই আর কি! বয়স বাড়লে পাখীরা মাথায় আর ল্যাজের দিকে বাড়ে। মানুষের মত তাদেরো মাথা আর ল্যাজ মোটা হয়। হয় না, তুমি বলতে চাও?"

টিয়া পাখীর বাচ্চা বলা হচ্ছে না তো! তা কে বলছে! প্রণবও সায় দিয়েছে আলোর সঙ্গে ঃ "টিয়া পাখীর ধাড়ী।"

"টিয়াপাখীকে আর এত ভালো হতে হয় না! কী সুন্দর বল তো? কেমন চমৎকার! আহা, যেমন একটি বন্য হরিণী! যেন হরিদ্বার আর কি! কন্‌খল্‌ নায়াগ্রা ফল্‌স্‌! অবিকল গাটাপার্চার! যেন—কী বলব? যেন আমার অবিমৃষ্যকারিতা! আহা!"

আহ্লাদে তিনি আই-ঢাই হন!

"কী ল্যাজের বাহার। ঝুঁটিই বা কেমন! রঙবেরঙের কারসাজিই বা কতো! যেন গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ের তত্ত্ব রে! জামাইষষ্ঠী যেন আমার! যেন ভীম নাগ কি আবার খাবো! সরস্বতী পূজোই কি না কে জানে!"

আনন্দের চোটে, কাকার ভেতর থেকে, পার্থিব-অপার্থিব সবরকম সার্টিফিকেট গড়গড় করে' গড়িয়ে আসতে থাকে!

প্রণব বলে: "কিরকম পাখা দেখছিস? পাখোয়াজ একেই বলে, জানিস?"

শ্যামল যোগ ছায়: "আর কি রকম ল্যাজ একখান! বাঃ!"

"এর কী নাম দেবে কাকাবাবু? লাঙ্গুলসম্রাট? নাকি, এর নিজের কোনো নাম আছে, কাকাবাবু?" সলিলের উৎসাহ সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে।

আমিও যা, ও-ও তাই!—" কাকাবাবু মুচকি মুচকি হাসেন, হাসেন আর বলেন, "একই নাম, প্রায় একজাতীয়ই নাম!"

"মিথ্যে বলচ না তো?" চোখ বড় করে বলে আলো—সেই সঙ্গে কাকার অপর পার্শ্বেও তাকিয়ে ছাখে এক ফাঁকে, ল্যাজট্যাজ কিছু গজিয়েছে কিনা দেখে নেয়। তারপর সন্দেহভরে ঘাড় নাড়তে থাকে: "উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার!"

"হ্যাঁ, কাকা বলেই ডাকতে পারিস ওকে—"সজোরেই সায় ছান কাকাবাবু।—"তোদের দু'নম্বরের কাকা! শুধু একটুখানি তুয়া যোগ! কাকাতুয়াই ওর নাম!"

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

কাবুলি-কাকাতুয়া-সংবাদ

পাখীটাকে সব চেয়ে ভালো লেগেছিল আলোর। ইস্কুলে গিয়েও তার স্বস্তি ছিল না, ত্ব'নম্বরী কাকাবাবুর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কাকাতুয়ার প্রাতুর্ভাবের প্রথম দিনের টিফিনের ঘন্টাটাকে সে বরবাদ করতে পারল না। দারোয়ানকে বলে কয়ে বেরিয়ে পড়ল ইস্কুল থেকে। ভালো করে', একাকী, সকলের অগোচরে পাখীটার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের তার দরকার। এখন প্রণব, শ্যামল, সলিল সবাই ইস্কুলে, বাড়ী নেই কেউ, এবং দারোয়ান তাদের ছাড়ন দেবে কিনা সন্দেহ—আলোকেই ছাড়তে চাইছিল না—বাড়ী থেকে খেয়ে আসেনি বলে' অনেক করে তবেই সে বেরুতে পেরেছে! পাখীটার সঙ্গে মুখোমুখি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় করবার এই তুর্লভ মুহূর্ত—আধঘন্টার টিফিনের এই অর্দ্ধোদয় যোগ।

আলো আস্তে আস্তে ঢুকল বাড়ীর মধ্যে। কেউ কোথাও নেই। কাকাবাবু আপিসে, একনম্বরের কাকাবাবু। কাকীমা ঘুমে অচেতন, অতখানি অচেতন যে, যে-বইখানি নিয়ে পড়তে শুয়েছিলেন তাতেই তাঁর পানের পিক গড়িয়ে পড়ছে, ইতিমধ্যেই যৎপরোনাস্তি পড়ে গেছে, তবুও তাঁর হুঁস নেই।

এবং, কাবুলি কোথায় কে জানে!

আলো পা টিপে টিপে গেল পাখীটার ঘরে।

ঢুকেছে কি ঢোকেনি, এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল কোত্থেকে ঃ "কি হে! জল খাবে নাকি এক গেলাস ?"

য়্যা? চমকে উঠল আলো। আগাপাশতলা চমকে গেল। কেউ কোথাও নেই, সব নিস্তব্ধ, কেবল চোখের সামনে ঘরের মাঝখানে ঝোঝুল্যমান খাঁচা, এর মধ্যে এরকম বেয়াড়া আওয়াজ বার করলো কে?

ত্ব'নম্বরের কাকাবাবু নয়তো?

কাকাতুয়ারা ডাক ছাড়ে, কাকাদের মতোই প্রায়—এবং তার অধিকাংশই ফাঁকা আওয়াজ, ঠিক কাকাদের মতনই; আলোর জানা ছিল। কাজেই সে ভয় খায়নি, ভড়কায়নি,—দমবার ছেলেই নয় সে—প্রথমেই যা-একটু ঘাবড়ে গেছল তাই—কিন্তু এখন সে মোটেই অপ্রস্তুত নয়—রীতিমতই সামলে উঠেছে এতক্ষণে।

অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে অযাচিত অভ্যর্থনা লাভ ক'রে তাকে উল্লসিতই দেখা যায়। সহাস্যমুখেই সে কাকাতুয়ার জবাব দিয়েছে:

"খেলে তো হয়। কিন্তু খাওয়াচ্ছে কে?"

এবং কাকাতুয়াকে একেবারে পরাস্ত করার অভিপ্রায়ে সেই সঙ্গে আরো শোনালো:

"গড়িয়ে দেবে নাকি তুমি?"

কাকাতুয়ার মুখে দ্বিতীয় কথাটি নেই। উচ্চবাচ্যই নেই আর! ভদ্রজন অপদস্থ হলে যেমন হয়। আলোর মনে আঘাত লাগে। খাঁচার বন্দী কোনো প্রাণীর কাছে, এহেন অসম্ভব দাবী উপস্থিত করে' তাকে লাঞ্ছিত করা তার উচিত হয়নি। কাকাতুয়া যে অপমানিত বোধ করেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে তখন সান্ত্বনা দিতে থাকে।

"না না! তোমাকে গড়িয়ে দিতে হবে না। তুমি কেন দিতে যাবে? তুমি আমার আহুরে সোনা! সোনা মাণিক তুমি আমার! তুমি কেন গড়িয়ে দেবে? ছিঃ ছিঃ!—"

বলতে বলতে সে খাঁচাটাকে শিক থেকে খুলে এনে বড়ো টেবিলের উপরে বসায়, আর নিজেও চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার পাশেই! পাখীটার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে—

আর তার মুখ থেকে অনর্গল বেরুতে থাকে ঃ

"বাঃ বাঃ ! কী চমৎকার তুমি ! কেমন তোমার ল্যাজ কিরকম তোমার রঙ। তুমি—তুমি কী সুন্দর ! —"

আলো যতই ওকে দেখছে ততই যেন বিভোর হচ্ছে। ততই যেন ওর ভালবাসায় পড়ে যাচ্ছে।

"তুমি—তুমি—তুমি—কী বলব ? দু নম্বরের কাকা বললে তোমার অপমান করা হয়। তুমি আমাদের কাকাবাবুর চেয়ে ঢের ভালো ! —ঢের ঢের ভালো ! —

এতখানি সমাদরের পর, কাকাতুয়াটা এতক্ষণে একটা কথা বলে। অপর পক্ষের এতখানি মুখরতার পর না খোলা তো ভালো দেখায় না।

"ঘাড় চুলকে দাও আমার।"

এই বলে' সে ঘাড় নীচু করে অপেক্ষা করে। খাঁচার শিকের বাইরে গলা বাড়িয়ে ধৈর্য ধরে' থাকে। এটা একটা খেলা, খেলাই মাত্র, মজার খেলা করা আর কিছুনা, এই তার চিরদিনের ধারণা।

কিন্তু সে-ধারণা তার এবার টলে যায়—

আলো এগিয়ে গিয়ে পেনসিল দিয়ে ঘাড় চুলকে ছায় তার—

পাখা ঝট্‌পট্‌ করে' পাখীটা পিছিয়ে যায় খাঁচার মধ্যে এরকমটা ঘটবে—সত্যিই তার ঘাড়ে কেউ হাত দেবে, এ ধরণের কোনো আশঙ্কা কখনো তার ছিল না। খাঁচার আর এক কোণ থেকে, মুখ কালো সন্দিগ্ধচোখে সে তাকাতে থাকে আলোর দিকে।

"কেন ? কী হোলো ? ঘাড় চুলকে দিয়েছিতো ? তবে ?" আলোও একটু আশ্চর্য না হয় তা নয়।

পাখীটা ঘাড় বেঁকিয়ে আলোর ভাবভঙ্গী দেখে। সভয়েই ছাখে। খাঁচার সুদূর কোণ থেকে এক পাও আর সে এগোয় না। আলোর কথার কোনো উত্তর ছায় না সে।

"ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ল ! এইবার আমি যাই ? কেমন ?" আলো

উঠে পড়ে হঠাৎ ঃ "কাল্‌কে আবার তোমার ঘাড় চুলকে দেব। টিফিনের সময়, কাল আবার, কেমন ?"

এই ব'লে কাকাতুয়াকে আশ্বস্ত ক'রে শশব্যস্ত আলোক ছুট মারে ইস্কুলের দিকে।

আলোও গেছে আর কাবুলিও ঢুকেছে বাড়ীর মধ্যে ; আলোদের আদুরে বেড়াল কাবুলি। কাকাবাবুর পরেই, বাড়ীর মধ্যে সে সর্বে-সর্বা —অন্ততঃ, কাকাতুয়ার আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তার আসন এখানে অটল ছিল।

দুপুর বেলা, আহারাদির পর, বাড়ীর গিন্নী দিবানিদ্রায় ব্যাপৃত হলে কাবুলি পাড়া বেড়াতে বেরয়। দিবানিদ্রা কিছু খারাপ না, দিতে পারলে ভালোই ; কাবুলিও দিবারাত্রে, যখনই ফুরসৎ পায় ঘুমিয়ে নেয় খানিক। কিন্তু বলতে কি, পাড়া বেড়ানো তার চেয়ে আরো ভালো, পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে, অন্য সব বেড়ালদের সঙ্গে, অন্যান্য বেড়ালদের বিষয়ে পরচর্চা করা, অনেকটা চুরি ক'রে দুধ খাওয়ার মতই চমৎকার। গৃহিনী দিবানিদ্রায় মগ্ন হলে, কাবুলি পাড়া বেড়াতে যায় —তার এই নিত্যকর্মে কোনো কামাই নেই—পরচর্চার সঙ্গে পরকৈদী মাছ ভাজা খেতেও সে কার্পণ্য করে না।

কাকাতুয়ার ঘরে সে পা দিয়েছে, কয়েক পা এগিয়েওছে—

"কী হে ! জল খাবে নাকি এক গেলাস ?"

শোনামাত্রই কাবুলি থ ! বেড়ালদের পিলে আছে কিনা কে জানে, থাকলে সেখান পর্যন্ত তার চমক গিয়ে পৌঁছেছিল নিঃসন্দেহ। সামান্য একটা পাখীর এত বড়ো কথা—এমন অসামান্য বাণী—তার গলায় হিজ মাস্টার্‌স্‌ ভয়েস্‌—শুনতে পাবে এমন সে কোনোদিন প্রত্যাশা করেনি।

এক পা তুলে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পা নামাতে, এমনকি, ম্যাও বলতেও ভুলে গেছে সে—

পাখীটা এবার গরাদের বাইরে মাথা গলিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে গলা ছাড়ে ঃ

"ঘাড় চুলকে দাও। ঘাড় চুলকে দাও তো আমার।"

এরকম অবস্থায় কাবুলির কী করা উচিত? কী করবে বেচারা? কিয়ৎক্ষণ সে ভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে। তারপর সাত-পাঁচ ভেবে, এক লাফে টেবিলের ওপর গিয়ে ওঠে—

কাকাতুয়াটার সনির্বন্ধ অনুরোধ সে এড়াতে পারে না—!

ঘাড় চুলকে ছায়, বলাই বাহুল্য!

ছেলেরা বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে খেলাধূলা করতে বেরিয়েছে। তারপরে খেলাধূলা সেরে বাড়ী এসে পড়তে বসেছে, কাকাতুয়ার ইতর-বিশেষ কিছু তাদের চোখে পড়েনি—

কাকাবাবু আপিস থেকে ফিরলেন সন্ধ্যার পরে। তাঁরই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ল—

কাকাতুয়ার ঘাড়-চুলকানো কাবুলি-কাণ্ড তাঁরই চোখে পড়ল সব প্রথম—

"ব্লাডিভাস্টক্‌রা সব যায় কোথায়? থাকে কোথায় সারাদিন?—

আর্তনাদ আর উচ্চ নিনাদ একসঙ্গে মিক্‌চার করে' তিনি আকাশ ফাটান্‌ঃ

"হতভাগা কাব্‌লে আমার ভুশুণ্ডিকে এদিকে সেরে ফেলেছে একেবারে! কোথায় গেল হনলুলুরা সব? য়্যা—?"

কাকার চীৎকারে সবাই ছুটে এসে জুটল। ব্লাডিভাস্টক্‌ সব ভাই। হনলুলুরাও বাদ গেল না। কাকীমাও হন্তদন্ত হ'য়ে এসে পড়লেন। চর্চরীর খুন্তি হাতে।

"কোথায় ছিলি সব তোরা? ব্লাডিভাস্টক্‌রা কোথাকার—?

কাকাবাবুর ঝটকায় শ্যামল-সলিলরা পিছিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ।

"হনলুলুদের সব একটাকা করে' জরিমানা! উহুঁ, ছটাকা করে বেতন কাটব সক্কলের!—

শোনবামাত্র চাকর-দাসীরা মুষড়ে পড়লো সব।

"ছ্যাখো দিকি গিন্নী! তোমাদের কাব্‌লের কাণ্ডটা একবার ছ্যাখো!

ঘাড়টা একেবারে খাব্‌লে নিয়েছে ভুশুণ্ডির! বাড়ীতে এতগুলো জানোয়ার,···এতগণ্ডা ডায়নোসেরাস্‌···নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল নাকি সবাই? একটা কাব্‌লেকে···একটা মোটে ডিব্রুগড়···তাই সামলাতে পারে না? সব ব্যাটা নরওয়ে! কোনো কম্মের নয়। কাজের বেলায় ভাগলপুর, আর খাবার বেলায় দেরাদুন! যা, যেখান থেকে পারিস ধরে আন বেটা কাব্‌লেকে। সেই হেল শালাসীকে একবার আমি দেখতে চাই! কুচি কুচি করে' কাটব ব্যাটাকে! কোথায় গেল হিপোপটেমাসটা? হুতোম প্যাঁচাটা গেল কোথায় শুনি? আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন!···

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

কাবুলির অন্বেষণে!

— একমাত্রাও বলা চলে! ছোট্ট একটা গোলাপ-পাপড়ির মতো একটুখানি। লুনা কাকাবাবুর একমাত্র মেয়ে, ওপরের ঘরে মাষ্টারের কাছে বসে পড়ছিল, ছাড়া পেয়ে ছুটে এল এতক্ষণে।

"কী হয়েছে বাবা, কী হয়েছে?"

"কাছে এসে ছাখো সে—" এই বলে' লুনাকে তিনি কাকাতুয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন: ঘাড়ের কাছটা কেমন ফেটে গ্যাছে দেখেছিস্!"

লুনা ভালো করে খুঁটিয়ে ছাখে, দেখে ঘাড় নাড়ে।

"কী মনে হয় তোর? লুনার বাবা মেয়ের অভিমতেরই যেন অপেক্ষা করেন।

"খুব শক্ত খাবার, বাবা!" কাকাতুয়ার কাঁধের ক্ষতির সঙ্গে জড়িত সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে—সব কিছু পর্যালোচনা করে, গম্ভীর মুখে, মুরুব্বিচালে, বেশ ভেবে-চিন্তেই লুনা জবাব দেয়। তাছাড়া আর কিছু না!"

"খুব শক্ত কী—? কী বললি?"

"খুব শক্ত খাবার।" লুনা পুনরুক্তি করে।

"কিসের শক্ত খাবার শুনি?"

"নরম খাবার খেতে পেলে কাকাতুয়ারা ভালো থাকে। শক্ত খাবার চিবুতে ওদের ভারী কষ্ট হয়। জানো বাবা, শক্ত জিনিস চিবুতে গেলে ঘাড় ফেটে যায় ওদের। খুব বেশী বেশী শক্ত খাবার খেয়েই—"

"তুই থাম্! আস্ত একটা ভিজাগাপটম্! মরে যাই আর কি!

কাকাতুয়ারা নরম খাবার খায়! তোকে বলেছে! এক নম্বরের কলম্বাস! সাণ্ডোমিংগো আমার! আমি জানি কেন ওর ঘাড় ফেটেছে। ওর কারণ হচ্ছে, খুব বেশী রকমের শক্ত খাবার নয়, খুব বেশী রকমের বেড়াল! এই বাড়ীর সেই এসিয়াটিক্ আরকিপ্লেগো—এই কালো বেড়ালটাই হচ্ছে এর ঘাড় ফাটার মূল কারণ! আমাকে আর বেশী করে বোঝাতে হবে না!—"

লুনা তবু অনেকবার ঘাড় নাড়েঃ "কিন্তু যা গরম পড়েছে, দেখেছ, বাবা, এই গরমের জন্যেও কাকাতুয়ার ঘাড় গলতে পারে। গরমের চোটে কি না হতে পারে বাবা? কৌটোর মধ্যে মাখম পর্যন্ত গলে যাচ্ছে!—"

"ঘাড় গলবে তার আর বেশী কি!" সলিল লুনার সহযোগিতা করে। বেড়ালের স্বপক্ষে, তাকে রক্ষা করতে, আসামী তরফের উকিলের মতো, নিজেরও ঘাড় সে গলিয়ে ছ্যায়—নিজের মক্কেলের সঙ্গে।

—"ঘাড় তো গলার কাছেই থাকে। ঘাড় আর গলা তো পিঠোপিঠি!"

"যা—যাঃ। ঘাড় গলা অত সস্তা নয়। কাকাতুয়াদের ঘাড় কদাচ গলে না! অন্ততঃ গরমে গলে না কক্ষনো! আমি দিব্যি গেলে বল্‌তে পারি। তোদের আর সাউখুরি করতে হবে না! যেন সব কেপ্-অফ্-গুড্-হোপ এলেন! ফিলিপাইন আইল্যাণ্ডস আমার।"

লুনার মা অবশেষে বলেনঃ "তুমি কি তাহলে বলতে চাও যে বেড়ালেই—?"

লুনার বাবার বাধা দিতে দেরি হয় নাঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ! বেড়ালেই সেই হতভাগা কাবুলি বেড়ালটাই! তোমাদের সেই ব্যাটাই ওর ঘাড়ে হস্তক্ষেপ করেছে। তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই! সে ছাড়া আর কার এত দায় পড়েছে ওর ঘাড় ভাঙবার?"

আলো আস্তে আস্তে উস্‌কে ওঠে এক কোণ থেকেঃ "কিন্তু কাকাবাবু, কাকাতুয়াটা তো কোন ধার ধারে না কাবুলির। কিচ্ছু তো ধারে না ওর কাছে, তবে কেন কাবুলি ওর ঘাড়ে হস্তক্ষেপ করতে

যাবে ? তুমিই বলো কাকাবাবু! তুমিই তো সেদিন বলছিলে, যে না ধারলে কাবুলিরা কক্ষনো কাউকে কিছু বলে না। তুমিই বলো !"

"নিশ্চয় ! কাবুলিটা এর ধারে কাছে এসেছিল নিশ্চয়, তা না হলে ঘাড়ে হাত দেবে কি করে ! ধারে আগে আসতেই হবে। আমি তো সেই কথাই বলছি। এখনো তাই বলছি। এখনো তাই বলছি —" এই বলে' কাকাবাবু এক ফুঁ-য়ে আলোকে একেবারে নিবিয়ে দ্যান।

কাকীমা বলেন: "কক্ষনো আমাদের কাবুলি নয়। সে নিতান্ত অহিংস। তার হৃদয় অতি কোমল। তাকে আমি ভালোরকম জানি ? কোনোদিন একটা মাছির গায়ে হাত দিতে দেখিনি। সে এ কাজ করতেই পারে না।"

"থামো ! থামো ! তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে ? আমি তো হনলুলুদের ডেকেছি, ব্লাডিভাস্টক্দের ! তোমাকে ডাকিনি তো ! তুমি শুয়ে শুয়ে তোমার নভেল পড়োগে যাও! তোমাকে এখানে এসে গিন্নীপনা করতে হবে না !—" এই বলে' গিন্নীকেও তিনি আরেক ফুৎকারে নির্বাপিত করার চেষ্টা করেন: "লুনার মা তো ! লুনার বেশী আর কী বুদ্ধি হবে ? লুনাটিক্ য়্যাসাইলামের বুদ্ধি !"

"কাবুলিকে ওর ঘাড়ে হাত দিতে কেউ দেখেচে ?" লুনার মা তবুও নিজের গোঁ ছাড়েন না, "কাবুলিরই যে কাণ্ড তার কি কোনো প্রমাণ আছে ?"

লুনার বাবা কিছু না বলে ঝুঁকে পড়ে নীরবে মেঝে থেকে কাকাতুয়ার লেজের একখানা পালক কুড়িয়ে নেন, সেই ছিন্ন পালকটি তুলে ধরে' পুনরায় তার লেজে সন্নিবিষ্ট করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুন না কেন, খসা পালককে কিছুতেই আর যথাস্থানে বসানো যায় না। কাকাতুয়া নিজেই নিজের প্রিভিয়াস্ লেজের প্রিভিলেজ্ ফিরে পেতে চায় না কিম্বা পালকটাই তার পালিতের পিঠে আবার চড়াও হ'তে গররাজি হয়, সঠিক বলা শক্ত,

কিন্তু কাকাবাবু তাঁর উদ্যমের ব্যর্থতায় ভারী ক্ষুব্ধ হন। সখেদে চেঁচিয়ে ওঠেন : "যত সব আহাম্মোক! ছোটোলোক কোথাকার!"

এই বলে' কাকাতুয়া কিম্বা সেই পালক কিম্বা দুইজনকেই এক চোটে গালাগালি করে' কাবুলির অন্বেষণে তিনি বহির্গত হন। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, ও-ঘর থেকে সে-ঘরে যান্, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা নেই। তাঁর পেছনে-পেছনে চলে কাকীমা, লুনা, তাঁর ভাইপোর ফৌজ! এবং দূরে দূরে যত নরোয়েরা, যারা কোনো কর্মের না, কাজের বেলায় ভাগলপুর, আর খাবার বেলায় দেরাদুন! বেল্লিক যতো বেলিয়ারিক আইল্যাণ্ডস্! বেলগ্রেড যতো! কাবুলির খোঁজে বক্কেশ্বরের বিরাট দলবল বেরিয়ে পড়ে।

হঠাৎ কাকাবাবুর খেয়াল হয়, খুঁজলেই শুধু হবে না, ডাকাও দরকার। তাকে যে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে, না জানলে, না টের পেলে, সে ব্যাটা বেরুবে কেন? আর কিছু থাক আর না থাক, কাবুলি হতভাগার মর্যাদা-জ্ঞান আছে। তাছাড়া, কারো আত্মসম্মানেই ঘা দেয়া উচিত নয়।

অতএব, অতীব মোলায়েম স্বরে, কাকাবাবুর হাঁক ডাক সুরু হয়, অত্যন্ত খাতির করেই তিনি ডাকতে থাকেন :

"মিঞা! মিঞাও! মিঞা আও!......"

ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করতে করতে তিনি চলেন। কিন্তু মিঞার কোনো সাড়াশব্দই নেই।

কাকাবাবুর অনুসরণে, প্রথমে আলো, তারপরে প্রণব-সলিল-লুনা কেউ বাদ না, সবাই মিলে নিজেদের সরু-মোটা গলা বার করে। সবাই মিলে বারবার ডাকাডাকি সুরু করে' দ্যায় :

"মিউ! মি-ইউ! মিঁউউ! ম্যাও! মেয়াও!......"

"এই! কি করছিস তোরা! সবাই কেন ডাকছিস? সবাই মিলে ডাকলে ভড়কে যেতে পারে! কাকাবাবু কড়কে দ্যান ওদের : "এতগুলো

বেড়াল একসঙ্গে বেরিয়েছে জানলে ওকি আর বেরুতে চাইবে না কি ? ভয় পেয়ে যাবে না ?

"হ্যাঁ, তোরা আবার ডাকছিস কেন ? তোদের গলা পেলে কাবুলি চলে আসতে পারে, সে হুঁস আছে ?" কাকীমাও ওদের সাবধান করে দিতে চান।

কাকীমার কথায় সলিলরা সবাই চুপ মেরে যায়, কেবল কাকাবাবু নিজেই মনোমুগ্ধকর কণ্ঠের নানাবিধ আলাপে, নানান কায়দায় অভ্যর্থনা জানাতে থাকেন, কিন্তু বেড়ালের তরফ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর আসে না। কোনো উচ্চবাচ্যই নেই ! বিচক্ষণ প্রাণী, এত গোলমালে, কিছু একটা বিপর্যয় ঘটেছে বুঝতে পেরে কোথায় যে ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে পড়ে, আন্দাজ করাই যায় না। অবশেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু কাকিমার দিকে ফেরেন ঃ

"গিন্নী ! তুমি ডাকো তো। তুমি ডাকলে বেরুবে বোধ হয়। তোমাকেই তো বেশী ভালোবাসে পাজীটা !"

"না বাপু, আমি ও সবের মধ্যে নেই—" কাকীমা স্পষ্টই বলে খ্যান ঃ "ওর ভালোবাসার জন্যে না,—বেচারীকে আমি ভালোবাসি বলেও বলছিনে, বেড়াল মারার ব্যাপারেই আমি থাকবো না। বেড়ালের গায়ে হাত তোলা খুব খারাপ !"

"রাবিশ্‌ !" কাকাবাবু বলেন ঃ "বেড়াল মার্‌লে ঢেঁকি হয় !"

"বেশ, তোমার ইচ্ছে হয় মারতে পারো। বেড়াল মেরে একজন লোক পাগল হয়ে গেছল আমি জানি।"

"য়্যাঁ ? বটে ? আমাকে ভয় দেখানো ? সন্ত্রাসবাদ ? ওসব কুসংস্কার আমার নেই, ওসবে আমি ভয় খাইনে ! ভড়কাইনে একদম্‌। ওসব সেকেন্দ্রাবাদ তুমি শিকেয় তুলে রাখো !"

মুখে বলেন বটে কাকাবাবু, কিন্তু মনে মনে যে একটুখানি ঘাবড়েছেন তাও বেশ টের পাওয়া যায়।

"তাছাড়া আমি নিজেতো মারতে যাচ্ছিনে, নিজে হাতে মারবো

নাতো, হনলুলুদের একজনকে বলব, সেই কাজ হাঁসিল করবে! এই ব্যাটা বান্দারাব্বাস্!—"

এই বলে কাকাবাবু চাকরদের একজনকে সম্বোধন করেন: "একটা টাকা দেব, পারবিনে কাবলের গলায় একটা কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে আসতে? জরিমানাও মাপ পাবি। জরিমানার টাকাটাও মাপ পেয়ে যাবি তাহলে।"

"আমি না কর্তা!" তথাকথিত বান্দারাব্বাস ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়: "তুএক টাকা কি বলছেন কর্তা? একশটা মোহর পেলেও একাজ আমি পারব না। বেড়াল মারা? বাপরে।"

"কী আমার মেহেরুন্নিসা! মোহর পেলেও পারবো না। কে যেন ওঁকে মোহর দিতে যাচ্ছে! মোহর আমার থাকলে তো! তিনি যে কোনো মোহের বা মোহরের বশীভূত নন সেকথা স্পষ্টই তিনি জানিয়ে দেন।

এইসবের মাঝখানে আলো একফাঁকে কাকাতুয়াটার ইনটারভিউ নিতে সরে পড়েছিল। সে ফিরে এসে নূতন খবরের লেটেস্ট টেলিগ্রাম ঘোষণা করে:

"কাকাবাবু ছ্যাখো, ছ্যাখো এসে! কাকাতুয়াটার একটা চোখ খুলেছে। দেখে এলাম আমি, অনেকটা সেরে উঠেছে এখন।

"বেশ, সেরে উঠে থাকে—যদি সেরে ওঠে, ভালো কথা—কোনো ক্ষতি নেই। কাবুলের কিছু হবেনা তাহলে। অবিবেচক নই—অবিচার করব না। অন্যায় ভাবে কাউকে মারতে চাইনে আমি। ন্যায়-বিচারই করব কিন্তু একথাও বলছি, ভুশুণ্ডি যদি এই খাবলানিতে মারা পড়ে—মানে কালকেও মারা যায়—তাহলে কাবলেরও বারোটা বেজে গেছে। তাহলে ওর আর বাঁচন নেই। খুনের জন্য ফাঁসি ওর হবেই।"

—চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

কাবুলির প্রতিদ্বন্দ্বী

কাকাতুয়াটা কিন্তু আশাতীত ভাবে বেঁচে গেল। প্রণব, শ্যামল, সলিল, এমনকি কাকাবাবু পর্যন্ত, সকলের আশঙ্কাকে বাঁচিয়ে বেঁচে বর্তে রইলো। সবাই ভাবল, এযাত্রা টিকে গেল বুঝি।

কিন্তু না, কয়েকদিন যেতেই পাখীটা ভারী কাহিল হয়ে পড়ল, দিনকেদিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল, এবং তার মেজাজ কেমন রুক্ষ হয়ে উঠল যেন।

লুনা এসে খবর দিল, গতিক সুবিধের নয়।

পাছে বেড়ালের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এই ভয়ে, কাকাবাবু, দু-নম্বরে আপনাকে মানে, কাকাতুয়াটিকে নিজের কক্ষগত করে' রেখেছিলেন। বেড়ালের সঙ্গে সঙ্গে, বেড়ালের পৃষ্ঠপোষকদেরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। লুনাই কেবল সে ঘরে সেঁধুতে পেত।

লুনা এসে জানাল, হ্যাঁ, বেঁচে আছে বটে—এখনও—কিন্তু কাবু হয়ে পড়েছে ভারী। ঘাড় তুলতে পারছে না বেচারা।

প্রণব, সলিল, শ্যামল, সবাই মুখ আঁধার করে' পরামর্শ করতে বসে গেল, কী করা যায় এখন? কাকাবাবু এক কথায় মানুষ, কথার নড়চড় হবার তাঁর যো নেই, পাখীটা মারা গেলে বেড়ালকে তিনি সহজে ছাড়বেন না, তাকেও নির্ঘাৎ সহমরণে যেতে হবে। অতএব এহেন পরিস্থিতিতে …?

উপরোক্ত অন্ধকার-মূর্তিদের জটলার মধ্যে আলো এসে হঠাৎ সঞ্চারিত হোলো। জিগ্যেস করলো চুপি চুপি: "কাকাবাবু কোথায় রে?"

আলোর হাবভাব দেখে মনে হয় সে যেন বাড়ীর ভালো ছেলেটি না, সেই আলো নয়, কূটচক্রী কোনো রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাদেরই যেন সে একজন।

বাজারের তরকারির থলেটা ওর দু' হাঁটুর মধ্যে নিয়ে আলো আবার প্রশ্ন করেঃ "কাকাবাবু এখানে নেই তো?"

লুনা বল্লেঃ "বাবা নিজের ঘরে। দাড়ি কামাচ্ছিলেন এতক্ষণ। খানিকটা কামিয়েছেন এমন সময়ে কাকাতুয়াটা ঘাড় উল্‌টেছে দেখে তিনিও উল্‌টে পড়েছেন।"

সলিল তার বড় বড় চোখ আরো বড়ো বড়ো করে ফেললঃ "য়্যাঁ? তারপর আর কামাচ্ছেন না নাকি?

"নাঃ আধখানা গাল কামানো হয়েছে কেবল!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল লুনা!

"ভারী মুস্কিল তো! ভারী মুস্কিল তো!" প্রণব শ্যামল ঘাড় নাড়তে থাকেঃ "ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার দেখছি!"

ভাবনার কথা তো বটেই। কম ভাবনার কথা নয়। কেননা এর সঙ্গে অনেক সম্ভাবনার কথা জড়ানো। সবাই মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে যার যতদূর সাধ্য – এক জোট হয়ে ভাবতে লাগে।

"আহা, এত ভাবছিস কেন তোরা? এর ভেতর কী আছে বল দেখি?

বাজারের থলেটার দিকে আলো ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "কী আছে বলতো?

ও-কথার স্বাভাবিক জবাব হচ্ছে তরকারি আনাজ, কাঁচকলা, পেঁয়াজ,কচু, ঘেঁচু ইত্যাদি! তাছাড়া আর কী থাকবে বাজারের থলেয়? কিন্তু আলো নিশ্চয়ই অতখানি সহজ উত্তরের প্রত্যাশায় ও-হেন প্রশ্ন পাড়েনি, কাজেই সকলেই নিরুত্তর থাকলো।

"তোরা তো করতে চসনা, করতে বললে তো ভারী ব্যাজার হোস! বাজার করার কতো মজা জানিস নে তো! বাজারে গেলে তাহলে

বুঝতিস! ভাগ্যিস আজ আমি বাজারে গেছলাম তাই—না হলে তো —" আলোর ভণিতা সুরু হয়।

আলোর বিস্তৃত আলোচনায়, বাজারে না গিয়েও, ওরা ব্যাজার হয়ে পড়ে।

"কী বলতে চাস বল দেখি? আধখানা ঝুনো নারকোল ফাউ পেয়েছিস এই তো—" ঝাঁঝালো গলায় শ্যামল বলে।

"তা আমাদের তোর ভাগ দিতে হবে না! একাই খাগে। আমরা এখন নারকোল খাচ্ছি! হ্যাঁ, আমাদের বলে ভাবনায় এখন ঘুম নেই!—" প্রণব ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

"লুনটিক্ য়্যাসাইলাম্, মানে, মা পর্যন্ত ভাবতে লেগে গেছে—" লুনাও জানিয়ে ছায়।

"তাই তো বাজারের কথা বলছিলাম বাপু! সব সমস্যার সমাধান তো এই থলের মধ্যে! এই থলের ভেতরেই সব! শুনবে না তোমরা তো করব কী! তোমাদের ভুশুণ্ডির জন্যে আমি যে কী প্রাণপাত করেছি—" এই বলে' আলো আবার সুরু করে: "—না শুনলে বলব কি ক'রে?"

আলো প্রাণপাত করলেও, থলের রহস্যে খুব সামান্যই আলোক-পাত হচ্ছিল, সমস্ত ব্যাপারই কেমন যেন জটিল হয়ে উঠছিল আরো। প্রণব শ্যামল সবাই হাঁপিয়ে পড়ল এবার: "কী—কী—শুনি? বল না শুনি।"

"হঠাৎ আমার এসে গেল বুঝলি? কি করে' এল বলি শোন!" আলোর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে: "বাজার করে' ফিরছি, এমন সময় দেখি, একজনের বাড়ীর দোর গোড়ায় একটা কালো বেড়াল। ঠিক আমাদের ভুশুণ্ডির মতো। এমনি নাতুস নুতুস— অবিকল একেবারে! আমি নীচু হয়ে বেড়ালটার মাথায় হাত বুলুচ্ছি, এমন সময়ে—বুঝলি—এসে গেল।"

"অমন ওরা এসে যায়।" সলিল বলে: "ভারী ন্যাওটা ওরা—"

"বেড়ালদের স্বভাবই ওই! শ্যামল যোগ দেয়ঃ "একটু আদর করেছো কি অমনি তোমার এসে গায়ে পড়েছে।"

"আহা, বেড়াল নয়! আমি বেড়ালদের কথা বলছি না?" আলো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—প্রতিভার অমর্য্যাদা হলে মানুষের পক্ষে যেমন ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক—তেমনি ক্ষোভাতুর কণ্ঠে সে বলেঃ

"বেড়াল না, আইডিয়াটা এসে গেল। আমি ভাবলাম, বাঃ এইতো বেড়ে! তুমি হয়তো আমাদের ভুশুণ্ডির যমজ ভাই কিম্বা মাস্তুত ভাই। কিংবা যাই হও, আমাদের কাকাবাবু একটা বেড়াল যখন মারবেনই, আদাজল খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন ভুশুণ্ডির বদলে তোমারই কেন বলি হোক না! তুমিই খতম হয়ে যাও না কেন? এই না বলে, চারধার তাকিয়ে, কেউ কোথাও দেখছে নাকি ভালো করে দেখে, বেড়ালটাকে আমি থলের মধ্যে পুরে ফেলেছি!"

"য়্যাঁ? ঐ বাজারের থলেয়? ঐ সব খাবার জিনিসের মধ্যে?" লুনা চেঁচিয়ে ওঠেঃ "করেচো কি ছোড় দা?"

"তাতে কি হয়েছে? তরকারী ধুয়ে নিলেই হবে। আলো, সত্যি তুই একটা জিনিয়াস!" প্রণব আলোর পিঠ চাপড়ে দ্যায়। "দেখি, বের করতো ভুশুণ্ডির মাস্তুত ভাইকে।"

"চিচিং ফাঁক!" বলে' থলের মুখ খুলে দিতেই থলের বন্দী দু নম্বরের ভুশুণ্ডি বেরিয়ে পড়ে।

বেরিয়ে আগে হাত পা খেলিয়ে নেয়। তার পরে, সবার দিকে তাকিয়ে, হয়তো একটু অবাক হয়েই ক্ষীণ একটা আর্তনাদ ছাড়েঃ "মিঁয়াও!"

অর্থাৎ, এ আমি কোথায় এলাম গো!

শ্যামল বল্লেঃ "এবার আমাদের কাবুলিকে নিয়ে আসা যাক। পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখা যাক দুজনকে।"

"উহুহু। অমন কাজটী কোরোনা।" আলো বাধা দেয়ঃ "তাহলে কোনটা যে কে তারপরে আর চিনতে পারা যাবে না।"

অতএব, দুজনকে, সযত্নে দুজনের থেকে দূরে রেখে, অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করে' দেখা হয়।

"হুবহু এক। আলাদা করবার যো নেই।" সলিল বলেঃ "কাকীমাকে বলিগে। কাকীমা ভারী খুশী হবে দেখলে।

"কী লাভ হোলো আরেকটা বেড়াল বাড়ী এনে ?" লুনা খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকেঃ 'কাকাতুয়াটা যদি না মরে,—ঘাড় উলটে পড়েছে বলেই যে মরবে তার কি ঠিক ? কাকাতুয়াটা যদি বেঁচে ওঠে তাহলে ? অতগুলো তরকারী সব নষ্ট—তার ওপরে আবার আর একটা বাড়তি বেড়াল বাড়ীতে !"

তরকারীর শোক লুনা কিছুতেই ভুলতে পারে না ! বেড়ালের বাহুল্যও ওর কাছে খারাপ লাগে !

আলো ঝিলিক মারেঃ "শুনছ বড়দা, শুনছ ? লুনা কী বলছে শোনো ! আমি কিনা কতো বুদ্ধি খাটিয়ে, ভুশুণ্ডিকে বাঁচাবার চমৎকার একটা ফন্দী বার করলাম, আর লুনা কিনা – !"

"বারে ! ঐ বেড়াল-ঘাঁটা নোংরা তরকারী কে খাবে ?" লুনা ফোঁস করে ওঠে।

"লুনা ! ছিঃ ! তরকারী আবার খায় ? তরকারী খাবার নামটি কোরো না" প্রণব মুরুব্বি-চালে মাথা চালতে থাকেঃ

"কী হয় তরকারী খেয়ে ? একদিন তরকারী না খেলে কী হয় ? তরকারী এমন কি দরকারি জিনিস ? তরকারী না খেয়েও জীবন ধারণ করা যায়। গোরুরা যে তরকারী খায় না, তা বলে' কি তারা মানুষ নয় ? তারা কি বাঁচে না ? গাধারাও তো খায়না, তারাই কি সব মরে আছে ? তরকারী কি আবার একটা খাবার জিনিস ? তরকারী খেয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে ? শুনি ?"

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

কাকাবাবুর কীর্তি !

কাকাতুয়ার অবস্থা টালমাটাল, লুনার কাছে খবরটা শুনা মাত্রই, প্রণবরা সবাই শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

শ্যামলদের বই খাতার একটা বাক্স ছিল, কাকাবাবুর বাতিল করা কাঠের বাক্স—তাতেই ওদের বইপত্তর সব থাকত। সেই বাক্সের মধ্যেই, কাবুলিকে লুকিয়ে রাখা স্থির হোলো আপাতত। প্রণব বাক্সটায়, গোটাকতক ছ্যাঁদা করে' বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা বানালো, বাক্সটাকে বায়ুভূক নিশ্বাসজীবী প্রাণীর বাসোপযোগী করে' তুললো সে। তারপর সমারোহ করে' কাবুলিকে সসমাদরে তার ভেতরে অভ্যর্থনা করা হোলো।

কাবুলি কিছুতেই বাক্সের ভেতরে ভর্তি হতে রাজি হয় না। আরেকটা বেড়ালের প্রথম দর্শনেই তার মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিল, এখন সেই সন্দেহ ঈর্ষায় ঘনীভূত হয়ে উঠে। সে বেশ বুঝতে পারে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পথ আবিষ্কার করার জন্যেই তাকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, সেই কারণেই যে তাকে বাক্সের মধ্যে বন্দী করে রাখা হচ্ছে, একথা টের পেতে তার দেরী হয় না।

কিন্তু সে ছেলেই নয় কাবুলি। অপর কারো জন্য নিজের সিংহাসন এবং স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে' স্বেচ্ছায় অন্তরীণে যেতে কিছুতেই সে প্রস্তুত নয়। বাক্সের ভেতরে সেঁধুতে বেজায় সে আপত্তি করে, রীতিমতই বাধা ছ্যায়। এমনকি প্রণব-আলো প্রভৃতির হাতে পায়ে আঁচড়ে-কামড়ে দিতেও ইতস্ততঃ করে না।

কিন্তু ওরাও সব নাছোড়বান্দা, বাক্সের ভেতরে ছেড়ে দিয়ে তবেই ওকে ছাড়ে।

"বাক্সের ডালাটার ওপর এবার বইখাতাগুলো চাপিয়ে দাও।" সলিল বলে। "ঠেলে উঠতে পারবে নাকো।"

আলো বলে ঃ "হুঁ, বইখাতাগুলো তালার কাজ করবে তাহলে। বেরুতে পারবে না বাছাধন।"

প্রণব বাক্সটার গা-চাবি পরীক্ষা করে ছাখে ঃ নাঃ, এটা লাগে না দেখছি। ভাঙা একদম! কিন্তু—কিন্তু—",

শ্যামল বলে ঃ "কিন্তু আবার কি? বইখাতাগুলো কি তোমার কম ভারী নাকি? বইটইসমেত ডালা ফেলে ও নাকি বেরুতে পারবে?"

লুনাও যোগ দেয়—"আমরা ডিক্সনারিটা দেব? দেব ওর ওপর চাপিয়ে?"

লুনার ওপর-চাপটা আলো বিবেচনা করে ছাখে ঃ "তাহলে আর বাছাধনকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে হবে না। সে একটা বেশ কাবুলিদাবাই হবে।"

"তা হলে হয় বটে। কিন্তু বই নিয়ে তো পড়তে হবে আমাদের, স্কুলেও যেতে হবে তো, তখন যদি ও হালকা পেয়ে—"

"তখন আর কি!" সলিল মুস্কিল-আসান করে "তখন লুনাকে বাক্সের ওপর বসিয়ে রেখে গেলেই হবে।"

"বারে!—" লুনা আপত্তি জানায় ঃ "আমার বুঝি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। নাইতে খেতে হবে না আমাকে? তোমাদের বেড়াল আগ্‌লাবো আমি, বেশ তো?

শ্যামল বলে ঃ "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে! কদিনের জন্যেই বা! এর ভেতর বুদ্ধি করে' বইয়ের জমাখরচ হিসেব মতন করলেই হবে, যাতে কিছুতেই কম ভার না হয় কখনো।"

কাবুলিকে বাক্সজাত করে' ছোট্ট একটা ঘরে লুকিয়ে রেখে কাকা-

তুয়ার ঘরে গিয়ে ওরা উঁকি মারে। কাকাতুয়াটা ঘাড় উল্‌টে পড়েছে, যথার্থ ই! স্বচক্ষেই দেখতে পাওয়া যায়। লুনার চোখ ছলছল করে।

কাকাবাবু ডাকেন ঃ "আয়, ভেতরে আয় সব। তোদের তু'নম্বরের কাকাবাবুর আর দেরী নেই। প্রায় হ'য়ে এসেছে। অন্তিমকাল আসন্ন।"

আলোর কান্না পেতে থাকে। ওর মুখপাত্র অশ্রুর তালিকা দেখা দেয়।

কাকাবাবু বলেন ঃ "কেঁদে কি হবে? কেঁদে কি কেউ কাউকে ফেরাতে পেরেছে? কান্নাকাটি করে কি কারুকে ধরে রাখা যায়? আটকানো যায় কারুকে? জন্ম মৃত্যু সংসারের নিয়ম। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে! যে মাইকেল একথা লিখেছিলো তিনিই মারা গেছেন নিজে।"

কাকাবাবুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—পড়তে থাকে উপর্যুপরি।

সলিলের মুখও কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে। আলো তো ভ্যা করে' কেঁদেই ফ্যালে।

"যাক, ওর আরেকটা শেষ ইচ্ছাও আমি পূরণ করব।" এই ব'লে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢালেন কাকাবাবু ঃ "ও আমাকে কতদিন বলেছে ওর ঘাড় চুলকে দিতে। আর এক গেলাস জল খাবার জন্যে কতদিন না সাধাসাধি করেছে। এতদিন আমি ভয়ে ওর ঘাড়ে হাত দিইনি, কি জানি কিহয়, কাকাতুয়াদের ঘাড় চুলকে দিলে, রোঁয়া-টোয়া উঠে যায় যদি। সেই রোঁয়া যদি গেলাসের জলের সঙ্গে মিশে পেটে চলে যায়? কিন্তু আজ একটু আগেই ওর ঘাড় চুলকে দিয়েছি। তারপর থেকেই কেন জানিনা, সেই যে ও ঘাড় নামিয়েছে, তোলেনিকো আর। বুঝতে পারছি আমার উপর অভিমানই ও ঘাড় হেঁট করে রয়েছে। লজ্জায় ক্ষোভে একেবারে ঘাটশীলা হয়ে গেছে। মনের তুঃখেই হয়তো, হয়তো বলছে, মরণকালে ঘাড় চুল্‌কে কী লাভ হোলো—যখন সময় ছিল তখন তো চুল্‌কালে না এখন এলে চুলকাতে? হায় হায়!—"

কাকাবাবুর দুঃখে সকলেই হায় হায় করে, মনে মনেই করে অবশ্যি।

"কিন্তু ওর দ্বিতীয় ইচ্ছাই বা কেন অপূর্ণ থাকে ? ও যেমন ঘাটশীলা হয়েছে, আমিও তেমনি জলন্ধর হবো। ও আমাকে এক গেলাস জল সেধেছিল, তিন দিন ধরে বলেছিল, আজ আমি তিন গেলাস জল খাবো —ওর কোনো বাসনাই আর আমি অচরিতার্থ রাখবো না। পর অন্তিম দুঃখ আমাকে দূর করতে হবেই।"

এই বলে' কাকাবাবু পর পর তিন গেলাস জল ঢক্ ঢক্ করে' বিরাট এক জলীয় ঢক্কার বা ঢেঁকুড় তোলেন।

"এইবার চল, সবাই মিলে হরিধ্বনি দিয়ে গঙ্গাযাত্রা করে' ভুশুণ্ডিকে নিয়ে যাই, মরণ কালে গঙ্গা লাভ করুক। ওর আত্মার সদ্গতি হোক।"

মৃতপ্রায় কাকাতুয়াকে কাঁধে করে' কাকাবাবু আগে আগে চলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোর দলবল অনুসরণ করে নবাগত বেড়ালটাও পিছু পিছু চলে, বেশ ভালোরকমের একটা ভোজ পেকেছে, ওর বরাতেই পেকেছে এইরকম কিছু একটা ফলারের আন্দাজ করে' আশান্বিত হৃদয়েই সে পেছনে পেছনে যায়।

বেড়ালটাকে সঙ্গে আসতে দেখে কাকাবাবু বলেন—"এই যে, কাবুলিও চলেছে গঙ্গাযাত্রায়। বেশ হয়েছে। তাহলে একটা থলে নেয়া যাক।"

এই বলে তিনি একটা বস্তা খালি করে' সেই অবস্থায়ই সেটা বগলে পোরেন।

বাড়ীর কাছেই গঙ্গা। কিন্তু গঙ্গাতীরে পৌঁছবার আগেই কাকাতুয়াটা পরপারে গিয়ে পৌঁছায়।

ভুশুণ্ডিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে' কাকাবাবু পেছনে ফেরেন : "কোথায় গেল কাবুলিটা ? সঙ্গে সঙ্গে আসছিল না ?"

তথাকথিত কাবুলি তখন জলের কিনারায় গিয়ে, পাখীটা গেল

কোথায়, সেই গবেষণাতেই ব্যাপৃত ছিল, কাকাবাবু অবিলম্বে, বিনাবাক্যব্যয়ে, গিয়ে তার ঘাড় পাকড়ান !

"আমার প্রতিজ্ঞাও আমি বজায় রাখব।"

এই বলে' বেশ বড়ো একটা নুড়ি রুমালে জড়িয়ে নিরীহ ওর গলদেশে বেঁধে ছ্যান।

"ওকে নিয়ে কি করবে, কাকাবাবু ?" সন্ত্রস্ত হয়ে আলো জিগ্যেস করে।

দেখতেই পাবি। দেখতেই পাবি এখুনি," কাকাবাবু গম্ভীর মুখে ব্যক্ত করেন ঃ "ভুশুণ্ডির সহমরণে ওকে পাঠাবো। জলজ্যান্তই পাঠিয়ে দেব।" কাকাবাবুর সুকঠিন মুখ।

—"এই বোরাটা তাহলে নিয়ে এলুম কেন ? এই বেড়াল তপস্বীর জন্যেই তো।" বলে বেড়ালটাকে ধরে থলের মধ্যে পুরে তার মুখ বেঁধে একটা ইস্টকখণ্ড সেই সঙ্গে বাঁধেন।

প্রণবরা কী করবে ভেবে পায় না। কাকাতুয়ার শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে—কাকাবাবু সত্যি সত্যিই একটা জীবন্ত প্রাণীকে সলিল-সমাধিতে পাঠাবেন, সে কথা ওরা ভাবতে পারেনি। তাহলে আলো হয়তো বেড়ালটাকে বাজার থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এভাবে মৃত্যুপথে টেনে আনতো না। কিন্তু না এনেই বা কী উপায় ছিল ? একটা বেড়ালকে তো মরতেই হোতো, কাকাবাবুর ক্রোধানলে প্রাণ দিতেই হোতো একটাকে। তাদের আদরের কাবুলিকেই দিতে হোতো হয়তো—সেই জায়গায় তার বদলে, অপরিচিত একজন নিজেকে আহুতি দিচ্ছে, কাবুলিকে বাঁচাতে আত্মবলি দিচ্ছে—দিয়ে শহীদ হচ্ছে—এইটুকুই যা ওদের সান্ত্বনা !

"কাকাবাবু, বেড়াল মেরোনা, কাকীমা বলে বেড়াল মারা ভারী খারাপ।" আলো তথাপি একবার উচ্চারণ করে।

"বেড়ালরা মরে ভূত হয়।" সলিলও সেইসঙ্গে যোগ ছ্যায় ঃ "ভারী বিচ্ছিরি ভূত হয় ওরা। আমি শুনেছি।"

"যা যাঃ! তোদের ওইসব আজ্‌গুবি গাঁজাখুরি আমি শুনতে চাইনে! আমার যে কথা সেই কাজ! ও যেমন আমার কাকাতুয়াকে খুন করেছে, ওকেও তেমনি আমি ফাঁসি দেব। জলে চুবিয়ে মারবো! আইনের এক চুল এদিকে-ওদিকে আমি নেই। কোনো বিস্‌চিকা কি ফিলাডেলফিয়ার বাজে কথায় আমি কর্ণপাত করছিনে।"

এই বলে বেড়ালটার গলায় পাথর বেঁধে, ওটাকে পাঁজাকোলা করে' ধরে' সজোরে ছুঁড়ে সলিল-গর্ভে সুদূরে তিনি পরিত্যাগ করেন। সলিলের বাধা মানেন না।

টুপ্‌ করে' ডুবে যায় বেড়ালটা।

"তোমাদের কেউ যদি এখন কাবুলিকে রাখতে চাও, যাও, গিয়ে নিয়ে আসতে পারো। আমার আপত্তি নেই।"

কাকাবাবুর কঠিন মুখে কাষ্ঠহাসির নামমাত্র দেখা যায়।..."কিন্তু ডুবে মারা গেলে আমি দায়ী হব না। কোনো গোঁয়ারতুমির গৌহাটিতে আমি নেই!"

জলের ওপর দু'একটা বুদ্‌ বুদ্‌ ভেসে ওঠে।...সেগুলি বোরাবুদর কি বুন্দেলখণ্ড, কাকাবাবু তা ব্যক্ত করেন না।

—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

কাকাবাবুর কেকাধ্বনি

সেদিন বিকেল পের না হতেই টের পেলেন কাকাবাবু।

ভর সন্ধ্যের ঢের আগেই বেড়ালের ভূত যেন তাঁকে ভর করলো। আচমকা কিসের ছায়া দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

শ্যামল আলো মালিকরা ছুটে এলো - কী হোলো, কী হয়েছে কাকাবাবু?'

'বেড়ালের ল্যাজের মত কী যেন একটা দেখলাম। ঐ দরজার গা ঘেঁষে চলে গেল।'

'বেড়ালের ল্যাজ?'

'কালো বেড়ালের ল্যাজ। যেমন ল্যাজ কাবুলির ছিল।'

'কাবুলির ছিলো? কিন্তু কাবুলিতো আর নেই কো কাকাবাবু? আপনি নিজেই তো তাকে স্বহস্তে—'

'জানি জানি। কিন্তু ল্যাজ যখন দেখা গেছে তখন ঐ ল্যাজের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বেড়াল আছে।'

'ল্যাজের পেছনে বেড়াল?' শ্যামল বিস্ময় প্রকাশ করে: 'বেড়ালের পেছনেই তো ল্যাজ থাকে জানি।'

'যা যা। দূর হ আমার সামনে থেকে। মতে সব বজ্ বজ্ জংশন! বাজে! কোনো কিছু যদি খবর রাখে।'

কিন্তু খবর ওরা ঠিকই রাখছিলো। কাবুলির যদি কোনো কাণ্ড-জ্ঞান থাকে! কাকাবাবুর নজরে পড়লে সর্বনাশ—সে খেয়াল কি আর আছে? কি করে ছাড়া পেতেই সোজা দোতলায় নেমে এসেছে। ভাগ্যিস, ল্যাজের বেশি আর কিছু কর্ত্তার চোখে পড়েনি।

কাকাবাবুর ঘরের দোর গোড়াতেই ওকে দেখতে না পেতেই শ্যামল তাকে আলগোছে তুলে নিয়ে সরে পড়ছে। টুঁ শব্দটি করতে দেয়নি।

কিন্তু খানিক বাদেই শব্দটা যেন কাকাবাবুর কানে এলো।

'আলো, শুনতে পাচ্ছিস? একটা বেড়াল ডাকছে না?

'বেড়াল?' আলো যেন হতবুদ্ধি হয়ঃ 'বেড়াল ডাকবে কেন?'

'ডাকবে কেন তা কি করে বলবো? কিন্তু আমার যেন মনে হোলো ডাকলো একটু আগে। স্পষ্ট শুনলাম।'

'কী শুনলেন কাকাবাবু?'

'শুনলাম যে ম্যাও। বেড়ালরা যে ভাষায় কথা বলে। বেড়ালের ডাক কি কখনো শুনিস নি নাকি?

'আপনার মনের ভুল কাকাবাবু।' আলো বলে; 'কানের ভ্রমও হতে পারে।'

'তুমি শুনতে পেয়েছিলে গিন্নি?' উপস্থিত কাকিমাকে তিনি সম্বোধন করেন।

'কী শুনতে পাবো—শুনি?

'না না, কিছু না।' কাকাবাবু নিজেকে সামলেছেন; ও কিছু না তবে।'

'আশ্চর্য তো! বেড়ালের ডাক শুনলে তুমি!' গিন্নি যেন অবাক হন—'অদ্ভুত কাণ্ড!'

সত্যি গিন্নি! ভাবতেও গায় কাঁটা দিচ্ছে আমার, নিজের কানে শুনলাম—একবার নয়! মনের ভ্রমও বলা যায় না, একেবারে হুবহু সেই—সেই অপয়া বেড়ালটার মতই গলা! যেন সে জলে ডুবে মরেনি, এখনো জলজ্যান্ত রয়েছে!'

'ওঁরা থাকেন!' গিন্নি স্বর্গীয় বেড়ালের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ান—'তখনি তোমাকে আমি মানা করেছিলাম, বেড়াল

মারতে যেয়োনা। বেড়াল মারা ভালো নয়, মা-ষষ্ঠীর বাহন। তখন তুমি শুনলে না। এখন—এখন যদি—

'থামলে কেন?'

'এখন—এখন যদি সেই কাবুলিকেই দেখি এ ঘরে ও ঘরে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে—ঠিক আগের মতই—একটুও আমি অবাক হব না।' গিন্নি শুধোনঃ 'ধরো, তাই যদি দেখা যায় তাহলে খুব মজার হয় না কি?'

'মজা? এই যদি তোমার মজা হয় তাহলে যে তোমার মজা। আমার কাছে মজা নয়।' কাকাবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানাল।

বেড়ালটা করেছিলো কি এর মধ্যে, নিজের পিঠের জোরে বাক্সের ডালাটা তুলে ফেলেছিল; তুলে ফেলেই না, এতদিনের বন্দীদশার পর একটু উন্মুক্ত বায়ুসেবনে বেরিয়েছিল। এ ঘরে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল একটু। তার সেই হাওয়া খাওয়ার ফাঁকেই কাকাবাবু তাকে দেখেছিলেন।

কিন্তু তার তেজস্বিতার বেশি তিনি দেখতে পাননি। নিজের লেজ দেখিয়ে সে ঘর থেকে বেরুতেই না শ্যামল তাকে সামলে ফেলেছে। সরিয়ে ফেলেছে নিরাপদ এলাকায়।

কাজেই তারপর অনেকক্ষণ কান খাড়া রেখেও কাকাবাবু বেড়ালের সাড়া পেলেন না। চোখ কটমট করে থেকেও না। তখন তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন, না, তাঁর আগেই ঐ বেড়াল দর্শনটা মনের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু রাত একটু না বাড়তেই, তাঁর মনের ভ্রম ভাঙলো। কিম্বা আবার দেখা দিল ভ্রমটা, তাও বলা যায়।

'লুনা লুনা! বলে তিনি এক হাঁক ছাড়লেন।

'কী বাবা? ডাকছো আমায়?' লুনা দৌড়ে এলো।

'তুই! তুই কি ম্যাও করলি?' বাবা তাকে শুধান।

'কী—কা করলাম!'

'ম্যাও!' বাবা যেন ক্ষেপে যান! 'ম্যাও! ম্যাও কাকে বলে জানিসনে? ম্যাও বলে বেড়ালের মত ডাকছিলি তুই।'

'আমি কেন ডাকতে যাবো ওরকম?' লুনা আপত্তি করে।

'কেন ডাকতে যাবি জানিনে!' ভয়ার্ত চোখে তিনি চারিধারে তাকান: কিন্তু অমনি একটা আওয়াজ পেলাম যেন! ঘরটা কী অন্ধকার! আর আমার ঘরটাতেই যতো অন্ধকার।'

'অন্ধকার কই বাবা? বেশ তো আলো রয়েছে।'

'আলো না হাতী! আমার চৌকির তলাটা একবার ছাখ তো ভালো করে। ছাখতো, বেড়াল টেরাল কিছু আছে কিনা...'

'তুমিই ছাখো না কেন বাবা!'

'না বাবা! আমি তাকাচ্ছিনে ওর তলায়! প্রাণ থাকতে না।'

'আমার কেমন ভয় করছে বাবা!'

'তাতো করবেই! বলে আমারই গা শিউরে উঠছে। যা, তোর দাদাদের সব ডেকে নিয়ে আয়। সবাই মিলে ছাখ দেখি চৌকির তলাটা।'

লুনা একটু ফিরে এসে বলে, দাদারা কেউ আসতে চাইছে না। ভয়ে কাঁপছে সবাই। কি জানি, কাবুলিকে যদি দেখা যায়, যদি সে চৌকির তলা থেকে তার বুলি ছাড়ে—

কাকাবাবু পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, তড়াক করে পা তুলে দেন চৌকির ওপরে।

'কী সর্বনাশ! কেউ ওরা আসতে চাইছে না! আমার বাড়িটা হয়েছে এক বান্দারাব্বাস!' কেউ যদি কথা শোনে!'

এই বলেই এক লাফে চৌকির ওপর থেকে নেমে সটান্ তিনি বারান্দায় চলে যান।

কিন্তু সেখানে গিয়েই কি কি রক্ষে আছে?

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সভয়ে নিজের ঘরের দিকে তিনি

তাকিয়ে থাকেন। কাবুলি তাঁর চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে দরজা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে কিনা!

কাবুলি কিন্তু এগিয়ে আসে ঠিকই, অন্যদিক থেকে। এ কদিন ধরে ছেলেদের অত্যাচারে সে তিত বিরক্ত হয়েছে, তাকে একটা ছোট্ট বাকসের খুপ্‌রির মধ্যে বন্ধ হয়ে চুপ করে থাকতে হয়েছে, ম্যাও-শব্দটি করতে পারেনি। বাক্সর হাত থেকে আজ ছাড়ান পেয়ে হাত পা একটু খেলিয়ে নিতে চায়।

আর জানাতে চায় নিজের ধন্যবাদ এই লোকটি। সারা বাড়িতে এই একটি লোক, একমাত্র মহদাশয় ব্যক্তি, যে নাকি তার ওপর কোনো অত্যাচার করেনি। তাকে বাক্সবন্দী করার ষড়যন্ত্রেও ছিল না। এই লোকটির পায়ে গা ঘেঁষে গিয়ে নিজের প্রাণের প্রণাম জানাতে চায় সে।

কিন্তু জানাতেই লোকটি এমন এক লাফিয়ে উঠেচেন যে কাবুলি কোনো বেড়ালিকেও অমন লাফ ছাড়তে কখনো গ্যাখেনি। দেখেই না দ্বিতীয় আরেক লাফে তক্ষুনি সে সেখান থেকে উধাও হয়েছে।

লুনার মা যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে।

'গিন্নী, ও গিন্নী! কি সর্বনাশ!' কাকাবাবু থর্‌থর্ করে কাঁপছেন।

'কী, হোলো কী তোমার?' তিনি এগিয়ে আসেন।

'আর কী হবে? তোমার—তোমার সেই কাবুলি—' তাঁর কম্পিত কণ্ঠ থেকে বেরয়—'বিশ্বাস করো আর না করো—যাকে আমি নিজের হাতে আজ জলে চুবিয়ে মেরেছি—কিন্তু মেরে ভালো কাজ করিনি—সেই এসে—আমার পায়ে গা ঘষে দিয়ে গেল এই মাত্তর।'

'কোন্ পায়ে?' গিন্নি শুধোন।

'কোন্ পা, তাতে কি এসে যায়? কর্তা খাপ্পা হন্। ওই! ওই তো দাঁড়িয়ে আছে—বারান্দায় ঐ কোণে! দেখতে পাচ্ছো তুমি?

'না তো'! গিন্নি চোখ পাকিয়ে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পান না।—'কই কিছুই দেখছি না তো? কোন্‌খানে? কোথায় সে?

'কোথায় আর দেখবে! সামনেই রয়েছে।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন কাকাবাবু : কিন্তু তুমি তো দেখতে পাবে না। আমাকেই দেখা দিতে এসেছে ও! শুধু আমাকেই···ওই···ওই চলে গেল ওধারে। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে।'

যাকগে, যেতে দাও। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়োনা।' সান্ত্বনা দেন গৃহিণী : 'ওরকম মাঝে মাঝে ও দেখা দেবে—হয়ত ডাকও শুনতে পাবে কখনো সখনো—কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করবে না ও। তুমি কিচ্ছু ভেব না।'

'না, ভাববে না। আজই আমি গয়ায় যাচ্ছি। এক্ষুনি। আজ রাত্রের ট্রেনেই। গয়ায় গিয়ে কাবুলির পিণ্ডি দিয়ে গোলোকে ওর গতি করে তবেই আমার নিস্তার। নইলে বেড়ালের ভূত নিয়ে এই ভূতুড়ে বাড়িতে এক দণ্ডও আমি তিষ্ঠুতে পারব না। বুঝেচ?

কারো মানা শুনলেন না কাকাবাবু। সেই রাত্রেই সুটকেস গুছিয়ে রওনা হলেন।

তারপরে তিনি গয়ার থেকে ফেরার আগেই কাবুলিকে আলোরা এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এলো।

তিনি হাওড়া ইষ্টিশনে পা দেবার আগেই কাবুলি হাওয়া!

—সপ্তম পরিচ্ছেদ—

ডিটেক্‌টিভ্‌ শ্রীভর্তৃহরি

—এক—

ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি সেদিন বিকেলে সবেমাত্র কলেজ স্কোয়ারের এক বেঞ্চে এসে বসেছেন···

জীবন? জীবন যা ভাবা যায় তা নয়, তার চেয়ে ঢের জটিল, ঢের রহস্যঘন। কিন্তু এহেন অনুভূতি ভর্তৃহরির জীবনে এই প্রথম—এই সদ্যোজাত রহস্য অতিশয় সম্প্রতি তাঁর অভিজ্ঞতায় এসে আলোড়ন তুলেছে।

ডিটেক্‌টিভ ভর্তৃহরিবাবু এই মাত্র তাঁর মোটর গাড়ীটি, মোড়ের পাহারোলার নজরবন্দী রেখে গোলদিঘিতে এসে বসেছেন। সান্ধ্যবায়ু সেবনের মতলবেই।

এই সময়টায় এইখানে এসে বসতে তাঁর বেশ লাগে। কাজকর্মের ফাঁকে ফোকরে অবকাশ পেলেই প্রায়ই তিনি এখানে এসে বসেন। দিঘির পশ্চিম দিকে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে ট্রাম বাস অম্‌নিবাস ট্যাক্সি মোটর অবিশ্রাম ছুটোছুটি করে চলেছে—আর কী জনস্রোত! আর এধারে, দিঘির এক কোণে, একটা বেঞ্চে অম্লানবদনে বসে শ্রীযুক্ত ভর্তৃহরি। ছুটবার কিছুমাত্র প্রয়োজন, বিশ্বের কোনো দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে নেই এখন। আপাততঃ—অন্ততঃ এই মুহূর্তে তো নেই।··· কথাটা ভাবতেই কী আরাম!

এই সময়টায় ভর্তৃহরিবাবুর ছুটি!

সেই বেঞ্চে, তাঁর পাশে, আধময়লা জামা-কাপড়ে একজন ভদ্রলোক, একটু বয়স্কই, কোনো দিকে কিছু মনোযোগ না দিয়ে কী যেন ভাবছিল।

আপন মনে কী ভাঁজছে লোকটা ? কোনো দুরভিসন্ধি কারুকে খুন করার মার্প্যাঁচ ? কিম্বা তার চেয়ে ছোটখাট কিছু—কারো পকেট কাটার মতলব।

ভর্তৃহরি তাঁর স্বভাবসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে দ্যান—পার্শ্ববর্তী লোকটির অন্তঃস্থল ভেদ করে' চালাতে চান্—কিন্তু পারেন না।

হয়ত বা পারতেন, তাঁর মর্মভেদী কটাক্ষে লোকটার মর্মভেদ করতে পারতেন হয়ত, অসম্ভব নয়, কিন্তু বয়স্ক লোকটি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতেই উঠে পড়ে হঠাৎ, এবং তেমনি ভাবিত হয়ে এক দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে জনসমুদ্রে মিলিয়ে যায়।

ভর্তৃহরির ওকে নিয়ে যাওবা ভাবনা হয়েছিল, ওর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাও তিরোহিত হোলো ; আবার কেন তিনি ভাবতে যাবেন ? অপরের সম্বন্ধে মাথা ঘামায় চোর আর ডিটেক্‌টিভ, একথা মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই পর যদি নিকটস্থ না হয়, যার-পর-নাই পর হয়ে যায়, তাহলে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ?

ভর্তৃহরি আরামের নিশ্বাস ফ্যালেন—উঃ! কোথাও যদি একটু স্বস্তি রয়েছে! ডিটেক্‌টিভদের জন্যে যদি শান্তি থাকে কোথাও! সব জায়গাতেই বদ্‌লোকের ভিড়—প্রায় সব ব্যাপারেই চক্রান্ত—সমস্ত কিছুর সঙ্গেই গোলমাল জড়িত। একদণ্ড যে নিশ্চিন্তে কোথাও বসে একটু বিশ্রাম উপভোগ করবেন তার যো কি! ওই যে ওই লোকটা, আধময়লা কাপড়চোপড়ে, বদ্‌খৎ, বিশ্রী ওই ব্যক্তিটি, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেল—ওর আর উনি কী করছেন ? যেরকম ওর ধরণধারণ আর আকারপ্রকার, নিশ্চয়ই ও কারু বাড়ী সিঁধ কাটতে কিম্বা খুব কমে সমে, অপর কারু পকেট ছাঁটবার উদ্দেশ্যেই উঠে গেছে—পথে ঘাটে বেওয়ারিশ কারুকে পেলে ধরে' খুন করতেই বা বাধা কোথায় ? উনি তার কী করছেন ? ওঁর উচিত ছিল ওর পেছনে পেছনে ফলো করা—তাহলেই ফলোদয় হোতো, ফলেন পরিচীয়তে হয়ে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু তিনি আর কী করবেন, কত করতে পারেন

একলা ? বিশ্বশুদ্ধ সবাই বদ্‌মাইস, আর তিনি একটি মাত্র ডিটেক্‌টিভ—না, ঠিক একমাত্র না হলেও, অদ্বিতীয় তো বটেন ! যথার্থ ভেবে দেখলে, তাঁর মতো ডিটেক্‌টিভ আর কয়জনই বা আছে ?

যাক্‌গে, যেতে দাও ! ধরাধামের যাবতীয় অপকর্ম আটকানো তাঁর সাধ্য না ! তিনি থাকতেও, পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্ব সত্বেও গোটাকতক খুনখারাপি, তাঁর হাত ফসকে, এমন কি, তাঁর নজর এড়িয়েই ঘটে যাবে ! চোখের ওপরেও ঘটতে পারে ! ঘটতে দাও ! ঘটুক ! নইলে দারোগারা করে' খাবে কি করে' ? দু' পয়সা পাবে কি করে' ? না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যাবে যে !

আধাবয়সী লোকটি উঠে যেতে না যেতেই, ভয়ঙ্কর একটা ঝাঁকুনিতে বেঞ্চি কাঁপিয়ে একজন তরুণ-বয়স্ক এসে সেই স্থান অধিকার করল—তার শূন্য স্থান পূর্ণ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল ঃ "ধুত্তোর !" ঝাঁকুনির তোড়ের মুখেই কথাটা বেরিয়ে এল তার।

ভর্তৃহরি সতর্ক হয়ে বসলেন। ওই বিরক্তিদ্যোতক আর্তধ্বনির মধ্যে পৃথিবীর সম্বন্ধে একটা অপ্রশংসাপত্র উদ্যত নেই কি ? কেমন একটা সমালোচনার ভাব প্রচ্ছন্ন নেই কি ওর ভেতর ? জগৎ সংসার যেন ওর সাথে বিশেষ সদ্ব্যবহার করছে না—এই গোছের একটা কিছু বিজ্ঞাপন ? পৃথিবীর প্রতি এই বীতরাগ—বৈরাগ্যবান এই ধরণের লোকরা তেমন সুবিধের হয় না, প্রায়শই দেখা যায়। ভর্তৃহরি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। আর অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যুবকটির অন্তঃস্থল—ওর এই আকস্মিক ভাবের অভিব্যক্তির মর্মভেদ করতে লাগল !

এও কি, এই তরুণটিও কি তাহলে, এর অগ্রগামীর মতই, এক নম্বরের—পাক্কা একটি—তাই না কি এ ?

কিম্বা এ বেচারী নিতান্তই গোবেচারী—অপরের, অন্য সব দুষ্ট লোকের চক্রান্তজালে বিজড়িত বিপর্যস্ত নাস্তানাবুদ এক হতভাগ্যই ?

অসহায় অবস্থায়, একান্ত সৌভাগ্যবশে, তাঁরই সাহায্যের উপকূলে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এমনটাও তো হতে পারে। এমন হয় না কি ?

বলতে কি, পৃথিবীতে এই দুদলই তো রয়েছে। এক দল নিরুপায়। আরেক দলের অসদুপায়। আর এরা ছাড়াও, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় অন্য এক দল আছেন, যাঁরা এদের পায় পায় বাধা দিচ্ছেন। এদের মিলনের পথে যাঁরা মূর্তিমান ব্যাঘাত! এদের উভয়ের মধ্যে ভালো করে' সংমিশ্রণ হতে—খাদ্যখাদক-সম্বন্ধ স্থাপিত হতে দিচ্ছেন না যাঁরা। এঁরাই শ্রীভর্তৃহরি। এঁরা ডিটেক্‌টিভ।

ভর্তৃহরির মনে হোলো, এমন তো হতে পারে, এর আগের অবাঞ্ছনীয় লোকটি চক্রান্ত জাল বিস্তার করে'—ছত্রাকারে ছড়িয়ে চলে গেছে, আর এই যুবকটি সেই জালেই জড়িয়ে জড়ীভূত হয়ে বিপদের অথৈ থেকে ঘাই মেরে ঠেলে উঠলো এই মাত্র ? অসম্ভব নয়!

এই পৃথিবীতে এবং এই গোলদিঘীতে কিছুই অসম্ভব না। কেবল দিঘির জলেই নয়, ঐ সলিলসীমার বাইরেও, মানুষের মধ্যে মৎস্য অবতারের—মাছের মতই বোকা জীবের কিছুমাত্র অভাব নেই।

তিনি একটু কৌতূহলী হলেন।

"তুমি কি কোনো অসুবিধায় পড়েচ বাপু ?" তিনি জিগ্যেস্ করলেন : "তোমার মেজাজ খুব ভালো দেখছিনে যেন !"

"মেজাজের অপরাধ কী !" যুবকটি তাঁর দিকে ফিরে তাকালো : "আমি যা মুস্কিলে পড়েচি মশাই, এমন অবস্থায় পড়লে আপনারও মেজাজ ঠিক থাকতো না। অনেক আগেই বিগড়ে যেত! এমন বোকামি করেছি—উঃ! বোকামি করে' মানুষ এমন বিপদেও পড়ে !" বলতে বলতে যুবকটি হঠাৎ চেপে গেল।

"বটে ?" ভর্তৃহরি ওকে উৎসাহ দিয়ে উস্কে দিতে চাইলেন : "বল দেখি কি হয়েছে ? কি রকম মুস্কিলটা শুনি ?"

"বলবো কি মশায়, আজ বিকালে—এই একটু আগে এসে

নেমেছি কলকাতায়। চেনা এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠব এই স্থির। বছর দুই আগে. আরেকবার যখন এসেছিলাম তাদের বাড়ীতেই ছিলাম। এখন সেখানে গিয়ে দেখি, কোথায় সেই বাড়ী, কোথায় কি? বন্ধুরও কোনো পাত্তা নেই!"

"বলো কিহে? খুনটুন করে' ফেরার নাকি তোমার সেই বন্ধুটি?" ভর্তৃহরির বিস্ময় আরো বাড়ে: "কিন্তু বাড়ীও নেই? বাড়ী পর্যন্ত লোপাট?"

বাড়ীর পলায়ন ভর্তৃহরির কাছে ভালো লাগল না। একটু বাড়াবাড়ি বলেই যেন বোধ হল। বাড়ীর পালাবার কি প্রয়োজন ছিল?

"না, না, বাড়ী ঠিকই আছে। বাড়ী কোথ্থাও যায়নি! যেতে পারে না।" যুবকটির মতো অতদূর নাস্তিক তিনি নন: "তুমি ভালো করে খুঁজে দেখেছ?"

"খুঁজতে কি আর বাকী রেখেছি মশাই? যদ্দুর খুঁজবার তার কসুর করিনি।" যুবকটি জানায়: "কিন্তু খুঁজে আর কি হবে? সেখানে সিনেমা হাউস খাড়া হচ্ছে, নিজের চোখেই দেখে এলাম।··· আপনি কি এর পরেও খুঁজতে বলেন?" যুবকটি জানতে চায়।

"হ্যাঁ, এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে বটে।" ভর্তৃহরি এতক্ষণে আন্দাজ পান: "আজ যেখানে ডাইংক্লিনিং ছিল, কাল দেখবে সেখানে চায়ের দোকান। বেমালুম রেস্তরা বনে' গেছে। তার দুদিন পরে যাও, দেখতে পাবে, রাতারাতি রেস্তরাঁ বদলে হেয়ারকাটিং সেলুন! নাপিত খচ্ খচ্ করে' কাঁচি চালাচ্ছে। চুল ছাঁটবার নামে রগ্ ঘেঁষে তোমার পকেটের ওপরেই! আর কিছু না, এসব জোচ্চুরি ব্যাপার। অসাধু লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে অত্যন্ত! আসল ব্যাঙ্ক মনে করে' আজ যেখানে তোমার টাকা রাখলে কাল দেখবে সেটা রিভার ব্যাঙ্ক! তোমার যথাসর্বস্বই জলে—তাঁরা দয়া করে' লালবাতি জ্বেলে বসে আছেন! যে যা পাচ্ছে, যেখানে পারছে, অপরের মেরে ধরে নিয়ে সটকে পড়ছে! লোক-ঠকানো ব্যবসা আর কি!"

"কিন্তু আমার বন্ধু বাড়ীসমেত উধাও হয়ে আমাকে যা ঠকিয়েছে মশাই, তার কাছে এসব লাগে না। ট্যাকসি-ড্রাইভার বল্ল তার জানা কোথায় একটা হোটেল আছে নাকি! তার জানা সেই হোটেলে আমাকে তুলে দিয়ে ভাড়া নিয়ে সে চলে গেছে। আর আমি করেছি কি, সেই হোটেলের একটা কামরায় আমার ব্যাগ বেডিং স্যুটকেস ইত্যাদি সব রেখে একটা টুথপেসট কেনবার জন্যে বেরিয়েছি—তারপর, তারপর আর কী বলব? সেই হোটেল আর খুঁজে পাচ্ছিনে এখন।"

"হোটেলের নাম কি?" ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর গলার স্বরে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণতা। ট্যাকসিড্রাইভার নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেছে—জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট মারেনি জেনে তিনি অনেকটা হতাশ হয়েছেন। এখন হোটেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এই! হোটেলছারা একটি যুবক মাত্র! তিনি বেশ একটু মর্মাহতই হলেন।

"তাই তো মনে পড়চে না মশাই, নাম মনে থাকলে তো হোতোই। তবে আর মুস্কিল কোথায়?"

"এ আর মুস্কিল কি? হোটেলটা এখান থেকে কদ্দুর? খুব কাছাকাছিই কি? এই গোলদিঘির আশেপাশে, হ্যারিসন রোড, মীর্জাপুর আর আমহার্স ষ্ট্রীট—এর সবই হোটেলে ভর্তি! এইখানেই যত্ত রাজ্যের হোটেল আর বোর্ডিং হাউস! আর একটা তো হোটেল নয়! যাক, একটু ঘুরতে হবে, এই আর কি! বাড়ীটা দেখলে চিনতে পারবে তো?"

"সেইখানেই তো গোল মশাই! কি রঙের কি ঢঙের, কি রকমের ক'তালা বাড়ী—কিছুই ভালো করে' দেখিনি! তাছাড়া, কাছ থেকে একটা টুথ্‌পেসট কিনে এক্ষুনি ফিরে আসব—ভালো করে' চিনে রাখবার দরকারও মনে করিনি—"

"এখন দেখচ সব চিনেম্যান—কাউকেই চেনা যাচ্ছে না?" ভর্তৃহরি যুবকটির ভগ্নহৃদয় রসিকতার রসে ভর্তি করতে চান: "—তারপর?"

"তারপর এ-দোকান সে-দোকান করতে করতে কখন রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি!"

"তাহলে তো সত্যিই গোল পাকিয়েছো হে! দস্তুরমত গোল!" অনুসন্ধানের সূত্র পেয়ে, এমন কি দীর্ঘতর একখানা সূত্র পেয়েও, ভর্তৃহরির অনুসন্ধিৎসা জাগে না।

গোরু খোঁজা আর বাড়ী খোঁজায় কার আর উৎসাহ হয়? তার ওপরে, গোরুর জন্যে বাড়ী খুঁজতে হলেই তো হয়েছে!

"ভারী মুস্কিল হয়েছে! বাড়ীটা তো চিনে রাখিই নি, কোন্ রাস্তায় যে তাও জানিনে! অথচ আমার জিনিসপত্র সব—সেই হোটেলেই থেকে গেল। টাকা কড়ি যা কিছু!" যুবকটি হতাশা-মাখানো চোখে তাকায়ঃ "এখন কী যে করি?"

"কি আর করবে? এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে স্বস্থানে প্রস্থান করা—যেখান থেকে এসেছ সেইখানেই পত্রপাঠ ফিরে যাওয়া। নিজের দেশে পিটটান দেয়া ছাড়া আর উপায় কি? এছাড়া তো আর পথ দেখচিনে। অবিশ্যি, কাছাকাছি থানায় একটা খবর দিয়ে যেতে পারো। তারা যদি তোমার হোটেল আর জিনিসপত্রের পাত্তা পায়, তো তখন তোমার দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।" বলতে বলতে ভর্তৃহরির মুখ বক্র হয়ে সন্দেহবাদে ভীত হয়ে ওঠে। পুলিসের কার্য-কারিতার প্রতি তাঁদের—ডিটেকটিভদের আস্থা যে কত কম, কীদৃশ অগভীর, সেই কথাটাই যেন তাঁর বদনমণ্ডলের চারিধার থেকে ভিড় করে' বিকশিত হতে থাকে।

"তা না হয় গেলাম। পুলিসে খবর দিয়েও গেলাম না হয়। দেশেই ফিরে গেলাম রাত্রের ট্রেনে। কিন্তু—কিন্তু—" কী যেন একটা কথা, বার হবার পথে, তার দাঁতের চৌকাঠে এসে হোঁচট্ খায়ঃ "কিন্তু বেয়ারিং পোসটে ফেরৎ যাওয়া যাবে না তো?

"তা তো যাবেই না। তা আর কি করে' যাবে? ভর্তৃহরি কথাটা গায়ে মাখেন না।

"না গেলেও যে হয় না তাও নয়। আপাততঃ অন্য কোনো একটা হোটেলে উঠে দুঃসংবাদ জানিয়ে বাড়ীতে তার করে' দিলেও হয়। বাড়ী থেকে টি এম্ ও-তে টাকা আনিয়ে নেয়া যায়। বাবা তো দেশের একজন জমিদার, টাকার তাঁর অভাব নেই, খবর পেলেই টাকা পাঠিয়ে দেবেন এক্ষুনি। কিন্তু—কিন্তু—" ছেলেটি আবার দ্বিধান্বিত হয়।

"কিন্তু আবার কি? এক্ষুনি তাহলে খবর পাঠিয়ে দাও—" ভর্তৃহরির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা: "তার করে' পাঠাতেই বা বাধা কি?"

"কিন্তু তার আগে একটা ঠিকানায় তো ওঠা চাই? টাকা আসবে কোথায়? দেখে শুনে একটা হোটেলে ওঠা দরকার বোধহয়?" যুবকটির জিজ্ঞাসু নেত্র।

"হোটেলের আবার অভাব কি?" প্রশ্নপত্র পাওয়ার সাথেই ভর্তৃহরির উত্তর দেয়া।

"কিন্তু—কিন্তু হোটেলে উঠতে-টেলিগ্রাম করতে—" ছেলেটির কোথায় যেন খট্‌কা লাগে আবার।

"পোষ্টাপিসটা কোন্ ধারে জানতে চাও?" ভর্তৃহরির জিজ্ঞাস্য হয়।

"উহু···হোটেলে উঠতে···টেলিগ্রাম করতে···টাকা লাগবে না কি? এসবের জন্যে টাকা লাগে বোধ হয়?"···যুবকটি এবার কোনোরকমে বাধা উৎরে সাদা বাংলায় আসে: "আর—আর টাকা আমার কই। আমার কাছে কিচ্ছু নেই।"

ভর্তৃহরি এই তথ্য বহুক্ষণ আগেই জেনেছেন। তাঁর কাছে এ সংবাদে কোনো নূতনত্ব ছিল না।

"আপনাকে—আপনি—আমাকে" যুবকটি এত আপনা আপানর মধ্যে পেয়েও বলতে ইতস্ততঃ করে: "আপনাকে সদাশয় ভদ্রলোক বলেই আমার বোধ হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন—যদি আমাকে সরল বিশ্বাসে গোটা কয়েক টাকা আপনি—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে আমি দিতাম যদি তোমার এই কাহিনীতে আমি আস্থা স্থাপন করতে পারতাম।" ভর্তৃহরি পরিষ্কার গলায় বলেন : "মুস্কিল হয়েছে কোথায় জানো ? হোটেল হারানোর জন্য নয়—" রূঢ় অপ্রিয় সত্যটা বলবেন কি না, ভর্তৃহরি মুহূর্তমাত্র ভাবেন।—টুথপেস্ট্ কিনতে বেরুনোতেও না—"

"তাহলে ?"

"মুস্কিল হয়েচে এই যে, সবই ঠিক, কিন্তু যে টুথপেস্ট্‌টা কিনেচ, সেইটেই কেবল দেখাতে পারচ না।"

ভর্তৃহরির বিচক্ষণের মত মৃদু মধুর হাস্য : "কাহিনীটা ফেঁদেছিলে মন্দ না—প্রায় অপরাজেয় কথাশিল্পীদের মতই বানাতে পেরেছিলে। কিন্তু তোমার গল্পের ঐখানটাতেই গলদ থেকে গেছে। আসল জায়গাটাই কাঁচা রেখে দিয়েছো! আর, সেই কারণেই ধরা পড়ে গিয়েছ! বুঝতে পারছি—"

সপ্রশংস আত্মাভিমানে ডিটেক্‌টিভের সারা মুখ রঙীন বইয়ের মলাটের মত মুখর হয়ে ওঠে : বুঝতে পারছি, এখনো ততটা পাকা হয়ে উঠতে পারোনি বালক!"

—দুই—

ভর্তৃহরির অভিযোগের সাথে সাথেই ছেলেটি চমকে যায়, চট্ ক'রে জামার পকেটে হাত পুরে দ্যায়···আর তারপরেই সে এক লাফে খাড়া হয়ে উঠে।

"কোথায় হারালাম তাহলে ?" যুবকটির সবিস্ময় কণ্ঠ।

"এক বিকেলের মধ্যে একটা হোটেল আর এক প্যাকেট টুথপেস্ট একসঙ্গে হারানো, পর পর হারিয়ে ফেলা—অনেকখানি অমনো-যোগিতার কারসাজি বলে' তোমার মনে হয় না কি ?"

ভর্তৃহরি আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলেটি শোনবার জন্য

অপেক্ষা করে না। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে, তিড়িং করে' লাফিয়ে উঠে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে চলে যায়। ঘাড় উঁচু করেই চলে যায় সে। সন্দেহবাদী, বিরুদ্ধসমালোচক, পক্ষপাতদুষ্ট, ভ্রান্ত জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করেই চলে যায়।

"বেচারী!" ভর্তৃহরির ঈষৎ সানুকম্প হন। "দেশ থেকে সদ্য ট্রেনে আসা, টুথপেস্‌ট কিনতে বেরুনো, হোটেল হারিয়ে ফেলা সবই ঠিকঠাক করেছিল—গল্পটা বানিয়েওছে মন্দ না! বলতেও পেরেছে বেশ—গড়গড় করে'—মাঝে মাঝে থেমে থেমে—দরদভরা গলায়—সবই প্রায় নিখুঁত—কেবল ঐ সামান্য একটু ত্রুটির জন্যেই সমস্তটা মাটি হয়ে গেল! আগাগোড়া আলগা হয়ে বেফাঁস হয়ে গেল বিলকুল! আরো একটু বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকে যদি, চক্‌চকে মোড়কে মোড়া টুথপেইস্‌টের একটা প্যাকেট দোকানের ক্যাশমেমো সমেত নিজের পকেটে মজুদ রাখতে পারত—তাহলে, বলতে কি, ওকে আমি একটা উদীয়মান প্রতিভা বলেই অ্যাখ্যা দিতে পারতাম। ওর জন্যে আর ভাবনা ছিল না তাহলে! নিজের লাইনেই ও করে' খেতে পারত!"

ভর্তৃহরির একটু দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

আস্তে আস্তে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে ওঠেন—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নজরে পড়ে যায়···বেঞ্চির তলায়, মোড়কে মোড়া—স্বল্পাকৃতি—কী ওটা? একটা টুথপেইস্‌টের প্যাকেট না? হাতে তুলে দেখলেন তাইতো? টুথপেস্‌টই তো বটে! দোকানের ক্যাশমেমো জড়ানো, সদ্যকেনা যে, তাতে কোনো ভুল নেই। বোঝা গেল, ছেলেটি যে সময়ে গাঁ-ঝাঁকি দিয়ে ঝুপ করে' বেঞ্চে বসেছিল, ঠিক সেই সময়েই এটা ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে টপকে ধরাশায়ী হয়েছে।

ভর্তৃহরি অর্দ্ধস্ফুট একটু আর্তনাদ করেন। ওঁর আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়। মানুষকে গ-সা-গু-র আঁকের মতো যতোটা সোজা মনে করেছিলেন তত সোজা নয়—মানুষের জীবনও গোলোকধাঁধার মত বেশ একটু জটিল বলেই তাঁর মনে হয়।

'নাঃ, ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হোলো। এই অজানা সহরে, অপরিচিত নির্বান্ধব জায়গায় নিরাশ্রম হয়, অসহায় অবস্থায় কোথায় না জানি ঘুরে মরছে !'

এধারে ওধারে চারিধারে খুঁজতে খুঁজতে যখন প্রায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন সেই ছেলেটিই, জনসমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় টাল খেতে খেতে, ওধারের মোড় ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে এধার-পানেই আসবার চেষ্টায় রয়েছে।

"ওহে, শোনো শোনো !" সাইরেনের আওয়াজের মতো ভর্তৃহরির একখানা ডাক !

যুবকটি উদ্ধতভাবে ফিরে তাকালো !

"তোমার গল্পের প্রধান সাক্ষী এসে পৌঁছেচে !" এই বলে, তিনি প্যাকেটে-আটক টুথপেস্‌টটা হাত বাড়িয়ে দিলেন :

"এই নাও তোমার টুথপেস্‌ট ! বেঞ্চির তলাতেই পড়েছিল। যখন তুমি ওখানে বসেছিলে তারই এক ফাঁকে ওটা হয়তো তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছল। তোমার অজান্তেই—তুমি টের পাওনি। তুমি চলে আসবার পর, উঠতে গিয়েই আমার নজরে পড়ল। যাক, যাকগে ···যেতে দাও !···তোমাকে অযথা সন্দেহ করেছি বলে' কিছু মনে কোরোনা। এই নাও, এখন এই গোটা দশেক টাকা হলে যদি তোমার চলে—"

এই বলে, ভর্তৃহরি তাঁর পকেট হাতড়ে নোটে টাকায় রেজকিতে এবং খুচরো খাচরায় মিলিয়ে যা ছিল সব ঝেড়ে ঝুড়ে ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন—

"—যদি এখনকার মতো তোমার চলে যায়—আপাততঃ একটা হোটেল দেখে ওঠা আর বাড়ীতে তার করে' দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করো—এবং— এবং আমার ন্যায় অবিশ্বাসপ্রবণ লোকের কাছ থেকে টাকাটা নিতে—অবশ্যি ঋণ হিসাবেই নিতে—তোমার তেমন অপত্তি না থাকে—"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে টাকাটা পকেটস্থ করে' তাঁর সমস্ত সমস্যার মীমাংসা ক'রে দ্যায়।

"—আর এই আমার কার্ড। এতে আমার নাম ঠিকানা আছে।" ভর্তৃহরি বলে' বলেন: "এই সপ্তাহের মধ্যে, বা পরে যখন হয়, বাড়ী থেকে তোমার টাকা এসে পৌঁছলে, তার পরে সুবিধা মতো যে কোনোদিন এই টাকাটা ফিরিয়ে দিলেই চলবে। আমার ঠিকানায় এম-ও করে' দিতেও পারো। আর, এই নাও তোমার টুথপেস্ট! ভালো ক'রে রাখো। আবার যেন কোথাও হারিও না! এই প্যাকেটটা তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুর মতই কাজ করেছে। খাঁটী বন্ধুরা যেমন ছেড়ে চলে গেলেও—দুঃসময়ে ঠিক ফিরে আসে। আসলে এরই কাছে—এর সদ্ব্যবহারের কাছেই তুমি ঋণী।"

"ভাগ্যিস, টুথপেস্টটা আপনি পেয়েছিলেন! এই বলে' ছেলেটি তো তো করে' কী দু একটা কথা যেন বলতে গেল—খুব সম্ভব, ধন্যবাদের ভাষাই হবে। এবং তার পরেই সে, যেধার থেকে এসেছিল, রাস্তা উৎরে, ফের সেই দিকেই চোঁ চোঁ করে' দৌড় মারলো।

"বেচারী!" ভর্তৃহরি মুখ থেকে বার হলো আবার—তরুণ যুবকটির উদ্দেশ্যেই। "ওপর ওপর দেখে আর কক্ষনো আমি কোনো মানুষের বিচার করব না। প্রায়ই ভারী ভুল হয় তাতে। উঃ, কী বিপদটাই না হোতো আজ! আমার ঠিক না হলেও ছেলেটির তো বটেই! কী অসুবিধাতেই না পড়ত বেচারা! নাঃ মহামতি শেকসপীয়র যথার্থই বলেছিলেন—হোরেশিয়োকে না কাকে লক্ষ্য করে' যেন বলেছিলেন, কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিলেন। জীবন যে কী বিশ্রী রকম জটিল, মানুষ যে কতদূর রহস্যময়!"

ভাবতে ভাবতে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পায়চারি করতে করতে আবার তিনি পার্কের মধ্যে ফিরে আসেন। গোলদিঘিতে আরো দু একটা চক্কর মেরে, গাড়ী ক'রে এবার বাড়ী ফিরবেন। ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরপাক খাবার মুখে, সেই আগের বেঞ্চির কাছাকাছি আসতেই

একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য তিনি দেখতে পান। এক ব্যক্তি অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে বেঞ্চির নীচে, আশে পাশে, চারিধারে ভারী উঁকি ঝুঁকি মারছে।

দেখবামাত্রই লোকটিকে তিনি চিনতে পারেন। ছেলেটির বেঞ্চি অধিকারের আগে, এই লোকটিই, তাঁর পাশের রাজ্য দখল করে' আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

"আপনার কি কিছু হারিয়েছে নাকি?" ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করলেন। —"কী খুঁজচেন অমন করে'?"

"হ্যাঁ মশাই, এইমাত্র কেনা—" লোকটি আর্তকণ্ঠে জানায়: "একটা টুথপেস্‌টের প্যাকেট।"

বলা বাহুল্য, সামলাতে ভর্তৃহরির বেশ একটু সময় লাগে।

মানুষ সম্বন্ধে তাঁর মতামত যে মুহূর্তে প্রায় বদলে এসেছে, এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিও আস্থা আর ততটা সুদৃঢ় নেই, এমন কি, নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকেই নতুন এক জীবন-দর্শন রচনায়,—কেবল রচনা কেন, মনের মধ্যে তার মুদ্রণে, পুনর্মুদ্রণে আর পুনঃ পুনঃ প্রুফ-সংশোধনে যে সময়ে তিনি মশগুল হয়ে আছেন, সেইকালে সে-সমস্ত সবকিছুর ভিত্তিমূল টলিয়ে দিতে এ আবার কি এক নতুন নিদর্শন?

আধাবয়সী লোকটি তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে' দ্যায়: টুথপেস্‌টের জন্যে তত না, ওটা হারালে তেমন কিছু ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওর মধ্যে —ওই প্যাকেটের ভেতরে, আজকের মাইনের"—বলবে কিনা, বলে' কী লাভ হবে ইত্যাদি ভেবে লোকটা নীরব হয়ে যায়।

"কখানা নোট্ ছিল?" ভর্তৃহরি জিগ্যেস করেন।

"আটখানা দশ টাকার নোট, এ মাসের মাইনের প্রায় সবটাই। টুথপেস্টটা কিনে ভাবলুম, যা পকেট মারা যায় আজকাল! নোট্‌গুলো ওর প্যাকেটের মধ্যে পুরে রাখলে নিরাপদ হবে। এই ভেবে রেখে দিয়েছিলুম।"

"আপনার বুঝি পঁচাশী টাকা মাইনে?

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় ঠিক ধরেছেন। নিরানব্বই টাকার সামান্য কেরানী আমি। আঠারো টাকা ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম্ জমা দিয়ে একাশী টাকা মোটে ছিল।" ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন: "কিন্তু আর একটি আধলাও আমার কাছে নেই। বাড়তি টাকাটা দিয়ে ছেলের জন্য টুথপেসট্ কিনেছিলাম।"

"হুঁ।" ভর্তৃহরি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"দেখুন, আপনার টাকাটা খোয়া যাবার জন্যে আমিই দায়ী।" গলাটা ঝেড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সুরু করলেন ভর্তৃহরি: "আচ্ছা, আপনি আমার বাড়ী চলুন। আমি ক্ষতিপূরণ করবো। আমি অবিশ্যি একটু দূরেই থাকি, কলকাতার কাছাকাছিও বটে আবার বাইরেও বলা যায়—এই ডায়মণ্ডহারবার রোডে। তা', আমার মোটর রয়েছে, যাবার সময়ে আপনার অসুবিধা নেই। আর ফেরবার ট্যাকসি ভাড়াটা আপনাকে আমি দিয়ে দেব।"

মজ্জমান লোকটি যেন দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে—দেবতা না হলেও একজন মহাপুরুষ তো বটেই—এবং 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন' সেই একমাত্র গন্তব্য পথ অনুসরণ করে' বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর মোটরে গিয়ে ওঠে।

ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ভর্তৃহরির মোটর হু হু করে' ছুটেছে। সহর ছাড়িয়ে—সহরতলী পার হয়ে—একটানা পীচ ঢালা পথের বুকের ওপর দিয়ে। দুধারেই ফাঁকা—নির্জন রাস্তা এবং মাঝে মাঝে এক আধখানা বাড়ী। বাগান বাড়ীই অধিকাংশ।

ভর্তৃহরি বেপরোয়া হয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে বসে—মুখ বুজে চুপটি করে'—সেই আত্মহারা সর্বস্বান্ত ভদ্রলোক!

হঠাৎ ভর্তৃহরির কেমন একটা খটকা লাগে, কেমন যেন সংশয় জাগে, তিনি পার্শ্ববর্তীর দিকে একবার ভ্রূক্ষেপ করেন। তার পরেই কুটিল একটা কটাক্ষ বাঁ চোখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। লোকটাকে যেন কুটি কুটি করে কাটে।

এই টুথপেসট্-হারা লোকটি সেই গৃহহারা যুবকটির মাস্তুত ভাই নয় তো ?

সন্দেহ হতেই তিনি নিজের বাঁ পকেটে হাত পুরে গ্যান—হুম ! ঠিক ঠিকই তো ! অবিকল -- যা ভেবেছেন !

তাঁর সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয় !

অমনি ডান পকেট থেকে তাঁর রিভলভার বার হয়ে আসে।

(গোয়েন্দাদের পকেটে আর কিছু থাক বা না থাক, পিস্তল আর হাতকড়া প্রায় সব সময়েই লেগে থাকে।)

লোকটির দিকে তিনি দোনলা লক্ষ্য করে' বলেন : "কই ঘড়ি চেন সব দেখি তো ?"

লোকটিও অমনি একটিও কথা না বলে' নিজের পকেট থেকে ঘড়ি চেন সব বার করে' গ্যায়। বিনাবাক্যব্যয়ে।

ভর্তৃহরি ঘড়ি চেন পকেটস্থ করতে করতে ভাবেন : "হুঁ. যা ভেবেচি ! পৃথিবী কি আর পালটায় ? রাতারাতিই পালটায় কি ? এতদিনের পৃথিবী একদিনে পালটাবার নয়। সব মানুষই প্রায় সেই রকমই রয়ে গেছে। আগের মতই দাগী···দেখি, হাত দেখি।···"

ডান পকেট থেকে হাতকড়ি মুক্ত করে' ভদ্রলোকের যুক্ত করে পরিয়ে দিতে তাঁর দেরি হয় না। তারপর, মোটর থামিয়ে লোকটিকে পথের মাঝখানেই তিনি নামিয়ে গ্যান্। পত্রপাঠ তৎক্ষণাৎ ! দয়া করে' পুলিসে আর গ্যান্ না, হাতকড়ি হাতে মরুকগে ঘুরে ঘুরে ! ঐভাবে করজোড়ে, অতখানি পথ পায়ে হেঁটে বাড়ী ফেরাটাই কি ওর কম শাস্তি হবে ?

তাছাড়া, তিনি ভেবে গ্যাখেন, ঐ রকম একটা আসামীকে নিজের ল্যাজে বেঁধে সরকারী ঘাঁটিতে পাকড়ে নিয়ে যাওয়াটাই কি কম দুর্ভোগ হোতো এখন ? এবং তাছাড়াও, তাঁর মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার ট্যাঁক থেকেও চেন ঘড়ি খোয়া যায়, তাঁর এত বড় বাহাদুরির পরিচয় থানা পুলিসে জানাবার এমন কী তাঁর গরজ ?

ভণ্ড কেরানীটিকে, নিজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সুযোগ সহ, বিপথে বিসর্জন দিয়ে, চিন্তাকুল চিত্তে তিনি গাড়ী হাঁকাতে থাকেন : "অ্যাঁ, পৃথিবীর হোলো কী ? মানুষরা সবাই যদি দাগী হয়ে যায়, প্রায় সকলেই যদি চোর ছ্যাঁচোর বনে' গিয়ে থাকে, তাহলে তিনি একলা ভালো মানুষ হয়ে, একাকী সৎলোক কতো দিক আর সামলাবেন ?"

ভাবতে ভাবতে তিনি ঘাবড়ে যান।

অবশেষে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি ভাবেন, ভেবে ছাখেন, যাক, তাঁর জানা শোনার ভেতরে একজনও যে সাধু ব্যক্তি তবু আছে, অসাধু-সঙ্কুল ঘড়িচোরদের জগতে এখনো যে টিকে রয়ে গেছে,—তিনি নিজেই রয়েছেন !—এইটাই কি বড় কম কথা ? কম বড় কথা কি ? একথা ভাবতেও কতোখানি আরাম !

পৃথিবীর অষ্টম পরমাশ্চর্য, সেই একমাত্র অভিব্যক্তির সম্বন্ধে সগর্ব ধারণা নিয়ে, (আয়নার অভাবে তার দর্শনলাভের কোনো উপায় তখন ছিল না), গৌরবের জয়পতাকা বহন করে' ভারাক্রান্ত মনে তিনি বাড়ী ফেরেন।

চৌকাঠের ওধারে পা না বাড়াতেই তাঁর ছোট ছেলে সত্যহরি ছুটে আসে।

"বাবা, বাবা ! তোমার চেনঘড়িটা তুমি আজ নিয়ে যাওনি যে ? তুমি তো বলো তোমার কোনো কাজে কক্ষনো ভুল হয় না ? তোমার নাকি দিব্য দৃষ্টি ! ভগবানের মতই সব কিছু তুমি টের পাও ? তবে আজ কেন এমন ভুলে গেলে ? টেবিলের ওপরই পড়ে রয়েছে, ছাখো গে ! তখন থেকেই পড়ে আছে, না, না, তুমি ভয় খেয়ো না বাবা, আমার অনেকবার ইচ্ছা হয়েছিল বটে কিন্তু ওটাকে আমি মেরামত করিনি। ভালো ঘড়ি মেরামত করে কি হবে ? ভালো ঘড়িকে অবশ্যি আরো ভালো করে সারানো যায় কিন্তু ভালো ঘড়ি সারাতে গেলে তুমি রাগ করো যে ! তুমি যে বলো ভালো ঘড়ি কখনো সারানো যায় না। শুধু একেবারে হারানো যায়। তাই ওর ঢাক্‌নি টাক্‌নি তাই কিছু আমি খুলিনি, একটুও কিছু করিনি, তুমি বাজিয়ে দেখতে পারো।"

—অষ্টম পরিচ্ছেদ—

রাজা হবার সোজা রাস্তা

সেদিন ছিলো শনিবারের বারবেলা। কফি হাউসের এক কোণে বসে আইসক্রিম খাচ্ছি।

বারবেলায় বার হবার বেলায় বাধা পেয়েছিলাম। আমার মনে কে যেন বারম্বার বলে উঠেছিলো উঁহু, বেরিয়োনা বাপু! বেরিয়োনা আজ এই শনিবারের বারবেলায়। নেহাৎ অশনিসম্পাত বরাতে নাও যদি হয়, জেরবার হতে হবে জেনো ঠিক।

তখনি জানি। 'এ সপ্তাহ আপনার কেমন যাবে'—এই খবরটা, খবরের কাগজে পেলে সব কিছুর আগে আমি পড়ি। এবারেও পড়েছিলাম, মানে গত রবিবারেই। কিন্তু পড়লে কি হবে, কিছুই তার মনে ছিল না। যা আমার বিস্মৃতিশক্তি! পড়েছি আর ভুলেছি।

কিছু ভুললেও, শনিবারের বারবেলাটা যে বড়ই মারাত্মক, একথা জানতে কোনো গণৎকারের কাছে যেতে হয় না। খবরের কাগজের থেকে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি না জানলেও চলে। তবে কিনা, বারবেলা হলেও কফির প্রলোভন দমন করা, আইসক্রিমের মায়া কাটানো কারো পক্ষেই সহজ নয়, তাই বারবেলাকেও অবহেলায় ঠেলে—বেরিয়েছিলাম। (শোনা যায় কফির মত কফিনের আমন্ত্রণেও লোকে বারবেলা কালবেলা কিছু বাছে না, এমনকি সঙ্গী সাথীও নয়, একলাই চলে যায়।)

কফি হাউসের এক কোণে বসে তপ্ত পানীয়ের শেষে ঠাণ্ডা মিষ্ট আইসক্রিম চাখছিলাম। এমন সময়ে একটি লোক বেশ হাসি হাসি মুখ নিয়ে এগিয়ে এলো।

চেনা নয়, দেখিনি কখনো, কিন্তু দেখলেই মনে হয় এর সঙ্গে

পরিচয় থাকা না থাকা বাহুল্য মাত্র। এর নাড়িনক্ষত্র জানার কোনো দরকার করে না। কারো পরিচয় পত্র বহন করে না আনলেও এ ব্যক্তি সকলেরই পরিচয়পাত্র। সর্বজনপরিচিত নকুড়চন্দ্রের কড়াপাকের মতই লোকটা।

এসে বসলো আমারই টেবিলে আমার মুখোমুখি। নিজেকে আমি বিশ্বপ্রেমিক বলে জাহির করতে চাইনে, কিন্তু ওর মুখ দেখে আমার মনে হোলো লোকটা কিছু খেতে চায়, কিন্তু নিজের ঘাড় ভেঙ্গে খাবার ছেলে এ নয়। এ যদি এখানে বসে কফি খায় তার দামটা, না বললেও চলে যে, আমাকেই দিতে হবে।

এক পেয়ালা গরম কফির অর্ডার দিলাম—অগত্যা।

"শুধু এক কাপ কফিই আনতে বলুন, তাহলেই হবে!" বললো সে—"এক কাপ কফি কেবল।"

আহা, আমি যেন ওঁর জন্যে এক জালা কফির অর্ডার দিতে যাচ্ছিলাম আর কি! আবার তার সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ, কাজুবাদাম পটেটোচিপস্—ইত্যাদি এইসব জালাতনের পালাও আছে নাকি আরো। "কী কাজ করা হয় মশায়ের?" বলে আরম্ভ করা গেল। তাছাড়া কী বলেই বা স্থুরু করা যায় আলাপ!

"কাজ? আপনি ঠাট্টা করছেন আমায়!" এক গাল হেসে সে জবাব দিলো—"কাজ আমি করিনে! কাজ করে আহাম্মোকে। আমি? আমি করবো কাজ? কোন্ দুঃখে?"

"কিন্তু কাজ না করলেও তো দুঃখ ঘোচে না"—বলতে যাই আমি।

"ধরাধামে এত সদাশয় মানুষ থাকতে? বলেন কী আপনি?" সে বললে: "এখনো তাহলে আপনি পার্থিব জীবদের সকলের সম্যক পরিচয় পাননি। কিন্তু আমি এঁদের টের পেয়েছিলাম ছোটবেলাতেই, যখন গড়ের মাঠে মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেতাম!—তখন থেকেই জানি যে—"

"কি রকম? জানার কৌতূহল হয় আমারও।—"কী রকম?"

"সর্বদা পরের উপকার করতে শশব্যস্ত, অপরকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়িয়ে হন্যে হয়ে রয়েছে কতো লোক! এরা থাকতে, আর এদের কিছু কমতি নেই দুনিয়ায়—দুঃখ কিসের? গড়ের মাঠে যেতাম, ট্যাকও তখন আমার গড়ের মাঠ—বুঝতেই পারছেন। কিন্তু খেলা দেখার কোনো অসুবিধাই হয়নি কোনোদিন। টিকিট কাটতেও হয়নি কখনো। এন্‌ক্লোজারের গা ঘেঁষে দাঁড়াতাম, আর উপর থেকে ছাতার বাঁট নামিয়ে দিতো—আনকোরা অচেনা লোকেরা—একটুও না বলতেই। আমি সেই বাঁট ধরে ঝুলে পড়তুম—আর তারা অবলীলায় টেনে তুলতো আমায়। ভেবে দেখুন, কিরকম পরহিতচিকীর্ষু—পরদুঃখকাতর, পরোপকারপ্রবণ—মানুষ সব। পরের জন্য নিবেদিত ছাতি নিয়ে এমন পরস্মৈপদী প্রাণ প্রায় দেখা যায় না। পরের ছেলেকে অকাতরে টেনে তুলেছে নিজের ছাতির একটুও মায়া না করেই। আর কী তাদের ছাতি—বুকের আর হাতের! তখনি আমি জেনেছি এমন সব লোক দুনিয়ায় থাকতে আমায় করে খেতে হবে না, কিছু না করেই খেতে পাবো।"

"তাহলেও—একটা কিছু তো করতেই হয়। কিছু না কিছু।" আমি বলি: "এন্‌ক্লোজারের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াতেও তো হোতো। আর, সেটাও কি একটা কাজ নয়?"

"হ্যাঁ, সেই কাজ। সেই একটা কাজ। গা ঘেঁষে দাঁড়ানো—মানুষের গায়ে পড়ে ভাব করা। ভাব করতে জানলে অভাব কিসের?"

লোকটির কথায়, এক্ষেত্রে, নিজেকেই আমার এনক্লোজার বলে ধারণা হতে থাকে। এবং বলতে কি, আমি একটুও বিড়ম্বিত বোধ করি না।

"তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু কাজ আমি করেছি বটে—করতে হয়েছে আমায়—মাঝে মাঝে।" বলেই চলে লোকটা: "এই যেমন ছারপোকার ওষুধ বার করা—থান ইট গুড়িয়ে সেই ইটচূর্ণ চটকদার প্যাকেটে পুরে

পেটেন্ট করে 'ছারখার' নামে বাজারে চালানো। তাও করেছি এককালে।"

"কী হোতো তাতে ?"

"কিচ্ছু না। অপরের ছারখার ছাড়া আর কী হবে ? তবে কারো ছারপোকা না যাক, তাদের টাকাটা সিকেটা আসতো বটে আমার ট্যাঁকে। কিন্তু দেখলাম, সেও ভারী ঝঞ্ঝাটের কাজ—ঐ ইট গুঁড়োনো। বিশেষতঃ গরমকালে। ছারপোকারাও আবার এমন পাজি—ঐ সময়-টাতেই দল বেঁধে দেখা দেয়।"

"ইট গুঁড়োনো আবার একটা শক্ত কাজ ?" আমি বলি।

"শক্ত বইকি! দাঙ্গার সময় ছাড়া তো অন্য সময় লোকের মাথায় ভেঙে গুঁড়োনো যায় না। নিজের হাতে ভাঙতে হয়। ইট ভাঙো, ভেঙে পাটকেল করো, তার থেকে ঢিল বানাও, ঢিলকে ফের হামান-দিস্তায় পেশো, তারপর ঢালো ছাঁকনিতে। ঢেলে চালো। তার থেকে মিহিন মসৃণ—সুরকির চেয়েও সূক্ষ্ম যে অপূর্ব জিনিসটি ছেঁকে বেরুবে, তাকেই আবার দামী স্বর্ণভস্মের মতো নিক্তিতে ওজন করে এক এক ভরি এক একটা রঙচঙে ঠোঙার মধ্যে ভরো। ভরে আরো রঙচঙে প্যাকেটে মুড়ে, তার ওপর লেবেল মেরে পকেটে নিয়ে ঘোরো বাড়ী বাড়ী। ট্রামে ট্রামে। ট্রেনে ট্রেনে। কম ঝকমারি।"

"এত কাণ্ড ?"

"হ্যাঁ' এত কাণ্ড উইদাউট এনি কারখানা। কোনো ভদ্রলোকের পোষায় মশাই ? অগত্যা বাধ্য হয়ে আমি বই লেখা ধরলাম। বার করলাম একখানা বই—"

"আপনি লেখক নাকি ? কী সর্বনাশ!" আমি শিউরে উঠি। আরেকটি বিভীষিকাকে যেন দেখতে পাই—আয়নার বাইরেই!

"সর্বনাশ বটে, তবে আমার নয়। 'না পড়িয়া পাশ করিবার সহজ উপায়'—বলে একখানা বই লিখে বার করলাম শেষটায়। কাগজে কাগজে কিছু কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপনও ছাড়লাম তার। ইঞ্চিখানেক করে।

বলব কি মশাই, বইখানা আমার কাটতো বটে ছেলেমহলে। বইখানার যে কোনো গুণ ছিলো তা আমি মনে করি না। গুণ-ভাগের জন্যে নয়, ভাগ্যগুণেই কাটতো আমার বইটা। যেসব ছেলে পাশ করতো, নিজগুণেই করতো, ফেল যেতে পারতো না বলেই করতো। তাদের মুখে মুখে সুখ্যাতি ছড়িয়ে বইটার কাটতি হোতো আরো। আর যেসব ছেলে ও বই পড়েও ফেল করতো—ফেল যাবারই কথা—ফেল যাবার পরে তারাও কিছু তাড়া করতো না আমায়। ফেল গিয়ে হয় তারা আধমরা হয়ে থাকতো, নয় তারা আত্মহত্যা করতো, নয়তো বাড়ী থেকে পিটটান দিতো। বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত পাশ করতই তারা। হয় ট্রেনে করে Pass করতো নয়তো পৃথিবী থেকে পাস করে যেতো। পরীক্ষায় ফেল তারপরে হার্টফেল—টু-মাইনাস মেক ওয়ান প্লাস—এই ভাবে দুই ফেলে এক পাস। একে বলে ফেলোফিলিং।”

বইটার নাম শুনে আমার লোভ হয়েছিল প্রথমটায়—আহা! আমাদের কালে এমন বই ছিল না, থাকলে আমিও হয়তো এক আধটা পাশ করে ফেলতাম, ফেল করে পাশাতে হতো না আমাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনে দমে যেতে হোলো। এপাশ না ওপাশ কোন্ দিকে যে ফিরতে হতো কে জানে! পাশের মায়ায় পৃথিবীর মায়াপাশ কাটাবার আমার উৎসাহ হয় না। তার চেয়ে বাপ মা ভাইবোনের পাশে থাকাই ভালো—সব ফেলেও।

“তাহলে এখন মহাশয়ের কী করা হয়?” আমি জিগ্যেস করি: “ঐ বই বেচেই চলে?”

“চলছিলো। কিন্তু এখন আর চালাইনে। তার চেয়েও ভাল জিনিস পেয়েছি কি না! রাজা হবার সোজা রাস্তা পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, যখন আপনি বলেছেন। তখন আনান না হয় আরেক কাপ। আপত্তি নেই।”

ঘরের মধ্যে দৈববাণী যদি হয়ে থাকে তো বলতে পারি না, নইলে আমি ঘুণাক্ষরেও আরেক পেয়ালা কফি পানের অনুরোধ জানাইনি

ওনাকে! এতক্ষণ পাশাপাশি আলোচনার পরেও। কিন্তু না জানলেও—আনাতে হোলো আরেক কাপ।

রাজা হবার সোজা রাস্তা তো ভেস্তে দেওয়া যায় না, জানতেই হয়। রাজা হবার সাধ কার নেই? আমারই নেই কি? হবার অন্ধি সন্ধিগুলোর হদিশ পেলে রাজা না হোক মন্ত্রী—মন্ত্রী না হয়তো উপমন্ত্রীও তো হওয়া যেতে পারে।

তারপর কিছুক্ষণের জন্যে তরল বিরতি। তরল আর স্বপ্নময়। তার কফিপান, আর আমার কফি-বিগলিত রাজা হবার স্বপ্ন দেখা।

"কাজ? কী কাজ? কি জন্যে কাজ?" কয়েক চুমুক মেরে সে ফের সুরু করে—"কার জন্যে কাজ? কিসের কাজ? কাজ করে ফায়দা? আপনি বলবেন—সকলেরই কাজ আছে, সবাই করছে কাজ। করুকগে মরুকগে, বয়েই গেল আমার। আমার কোন পরিশ্রমে কাজ নেই কাজ করার দরকার করে না। পরশ্রমেই আমার চলে যায়। কারণ বড়লোক হবার মোক্ষম উপায় আমার কাছেই আছে। এই পকেটেই রয়েছে আমার। এই যে লেফাফা দেখচেন—এর মধ্যেই।" এই বলে সে নিজের বুক পকেটের মধ্য থেকে ভাঁজ করা একটা খাম বার করলো—"এর মধ্যেই রয়েছে সেই কৌশল। কি করে সহজে—মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে—হাসতে হাসতে টাকা রোজগার করা যায়।"

লে বাবা। ঐ লেফাপার মধ্যে এত ব্যাপার? এ বলে কি?

"অ্যাঁ? বলেন কি মশাই?" আমি হাত বাড়াই খামখানার দিকে। আমারও যে মাথার ঘাম, ঠিক পায়ে না হোক, কাগজে ফেলেই টাকা উপায়! রোজকার কাজ আর রোজগার।"

"উঁহু। অতো সহজে না।"—লোকটা খামটা সরিয়ে নেয় আমার নাগালের থেকে। দূরে রেখে দেখায়, "দাম আছে খামের। বড় লোক হবার কায়দা কানুন জানবেন, আর তার দাম দেবেন না?

"কতো দাম?" "আমি জানতে চাই, "আপনার খামের শুনি?"

"বেশী নয়, পঞ্চাশ টাকা। তবে আপনার মত সদাশয় ব্যক্তিকে দশ টাকাতেই দেব। তবে হ্যাঁ, একথা আমি হলপ করেই বলছি, এর অন্তর্নিহিত রহস্য জানলে অনায়াসে আপনি বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ একশ যত খুশী আমদানী করতে পারবেন—একটুও খাটাখাটনি না করেই···"

আমি একটু ভাবি। একেবারে করকরে দশটা টাকা?

"হ্যাঁ, কোনো পরিশ্রমই নেই। আরাম করে উপায় করুন, আর উপায় করে আরাম করুন···" বলতে থাকে লোকটা।

"নিন আপনার দশ টাকা।" একখানা নোট হাতে তুলে দিই।

কফির শেষ ফোটাটি নিঃশ্বেষ করে লোকটা ওঠে। খামখানা আমার হাতে দিয়ে কফি হাউস ছাড়ে। সে চলে গেল আমি তার লেফাটা ছিঁড়ে খুলে দেখি তাতে লেখা—

"যদি সহজে পয়সা কামাতে চাও তাহলে আমি যা করছি তাই করো। রোজ এমনি করে একটা দাঁও মারো। এই রকম খাম অন্তত দুখানা করে চালাও। পৃথিবী বোকা আর ভালো মানুষে ভরাট, ধরে ধরে গছাও তাদের। গায়ে পড়ে ভাব করতে জানলে ভাবনা কী? অভাব কিসের?

কিন্তু বাপু তুমি যতই চালাক চন্দর হও, যতই দাঁও মারো, যতোটা বোকা ভেবেছো আমায়—মোটেই আমি তা নই। যখন তুমি ঐ লেফাফাখানা বার করেছিলে তখন সেই ফাঁকে তোমার পকেট থেকে যে একশো টাকার নোটখানা পড়ে গেছল—সেদিকে তোমার খেয়াল ছিলো? নোটখানা আমি তক্ষুনি পা চাপা দিয়েছিলাম—আমার জুতোর তলায় চেপে রেখেছি—তখন থেকে চাপিত রয়েছে এখনো। হুঁস ছিলো বাছাধনের?···আমি মৃদুমধুর হাস্য করি। লোকটার বিনা পরিশ্রমের—সারাদিনের মাথার ঘাম পায়ে না ফেলার সব রোজগার—আমার এই পদতলে। আমার হাতের মুঠোয়।

পায়ের তলা থেকে হাতের তেলোয় আনি নোটখানা। ওমা একি,

নোটখানা একশোর নয়—এক লাখের। এবং টাকার নয় ধন্যবাদের। বড়োদিনের সময় মিশনারী চার্চ থেকে শত সহস্র শুভেচ্ছা জানিয়ে যেসব নোট বার করা হয় তারই একখানা। দেখতে কারেন্সি নোটের মতই হুবহু।

তখনি জানি। শনিবারের বারবেলায় বেরুলে এমনটাই হবে, লোকসান আছেই বরাতে। সব চেয়ে ঘরে বসে—এমন কি শুয়ে শুয়ে—বারবেল ভাঁজাটাও ভালো ছিলো! কাজ দিতো ঢের।

এ সপ্তাহটা বেজায় খারাপ গেছে আমার, কী বলবো!

—নবম পরিচ্ছেদ—

জলযোগে প্রাণান্ত

আমরা ওঁকে 'একাদশী মুখুজো' বলেই জানতাম।

ওঁর এহেন নামডাকের কারণ এই, কেবল দুটো দিন বাদ দিয়ে সারা মাসটাই উনি একাদশী করতেন। একাদশী মানে, একবেলা খেয়ে থাকতেন। এ বিষয়ে ওঁর রেকর্ড ছিল পুরো আশি বছরের পাকা রেকর্ড। শুধু একাদশীর দু'টো দিন বাদ যেন, সে—দু'দিন দেন তাঁর 'অনাদশী'—অর্থাৎ একেবারে অনাহার।

উনি বলতেন, ওতেই ভালো থাকা যায়, সুখে থাকা না হোক বেঁচে থাকার ওই যে প্রশস্ত উপায় তার প্রতিবাদের সাহস কে করবে ? কেননা তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ উনি নিজেই। যদিচ ওরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আর বর্তমানে নেই, আমরা হারিয়েছি, অতীতের গর্ভেই এখন। কিন্তু পঁচানব্বই বছর তো বেঁচে ছিলেনই, আকস্মিক দুর্ঘটনাটা না ঘটলে, আরও পঁচানব্বই বছর যে কায়ক্লেশে বাঁচতেন না এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

শ্যামরতন বাবুর বাবা 'অকালে' মারা গেছেন, সবাই শুধু এই খবরটাই পেয়েছে, কিন্তু কী দুঃখে এবং কোন দুর্ঘটনার ফলে যে তিনি অকস্মাৎ দেহরক্ষা করলেন, যে মর্মন্তুদ কাণ্ড না ঘটলে তিনি কিছুতেই অমন করতে যেতেন না তা কেবল আমিই জানি। আমি আর প্রত্যুষ। প্রত্যুষ আর প্রত্যয়। ওরা ওদের পাশের বাড়ির—আমার সঙ্গে এক কেলাশে পড়ে—আলাদা ইস্কুলে। ওদের কাছেই আমার শোনা।

যে জলের ছোঁয়াচ থেকে তিনি সর্বদা সাবধানে আত্মরক্ষা ক'রে

চলতেন, নিদারুণ সংকটকালে সেই জলস্পর্শ ক'রেই তিনি মারা গেলেন! জলের আস্বাদ জলের চেয়ে ভালো হওয়াই তাঁর অপমৃত্যুর কারণ।

জলের এই ইতরবিশেষ—বিশেষ রকমের এই ইতরতা তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না বলেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

জল তিনি যে একেবারেই পান করতেন না তা নয়, করতেন সামান্যই—কিন্তু স্নান? আদপেই না। স্নান করতে হলে জল ছাড়া আরও একটা জিনিস লাগে। তেল। তেল মাখতে হয়। জলে পয়সা খরচা নেই বটে, কিন্তু তেলে আছে। এই জন্যেই তিনি স্নান বর্জন করেছিলেন।

সেটা অবশ্য আমাদের আন্দাজ। তাঁর ব্যাখ্যা অন্যরকম ছিল। সেটা আমি জেনেছিলাম যেদিন রাস্তায় আমাকে ধরে তিনি জিগ্যেস করলেন—"গোরা, তুমি কি চান কর?"

আমি আর মনটু দু'জনে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে, মাঝ রাস্তায় আমাদের মাঝে প'ড়ে তাঁর এই অদ্ভুদ প্রশ্ন! আমি উত্তর দিই—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"প্রত্যেক মাসেই?"

"মাসে? হ্যাঁ, মাসে তো বটেই। সকালে নেয়ে টেয়ে ইস্কুলে যাই, আবার ইস্কুল থেকে ফিরেই ফের চান করি।

তাঁর চোখ দু'টো কপালে গিয়ে ওঠে—"ব—লো কি!"

"তারপর সন্ধেয় ফুটবল খেলে এসে আবার একবার চান করতে হয়।"

"য়্যাঁ!" তাঁর চোখ দু'টো যেন বেরিয়ে আসার জন্যে অস্থির।

"তবে রাত্রে আর করা হয় না, তখন ঘুমই কিনা। ঘুমোলে পরে চান ফানের কথা আর মনে থাকে না। কিন্তু ভোরে উঠেই চলে যাই আবার লেকে সাঁতার কাটতে। তাতেও অনেক সময়ে চান করা

হয়ে যায়। আগাপাশতলা না ডুবিয়ে তো সাঁতার কাটা যায় না। কী করব ?”

বহুক্ষণ তাঁর মুখ থেকে বাক্যস্ফুট হয় না। অবশেষে বলেন, —“কূপের দড়ি দেখেছ ?”

আমরা ঘাড় নাড়ি।

“দুটো দড়ি কেনো। কিনে একটা সিকেয় তুলে রাখ, আর একটা দিয়ে অনবরত জল তোলো। দেখবে যেটা নির্জলা তোলা আছে সেটার অখণ্ড পরমায়ু, আর যেটা কেবল কূপে চোবানি খাচ্ছে তার আর দেখতে হবে না—এই হয়ে এল বলে। আমি মোটেই চান করি না, দেখছো তো, এই পঁচানব্বই বছরেও কেমন তাজা টন্‌কো রয়েছি। আর তোমরা ? তার ঢের আগেই তোমরা পচে যাচ্ছ। কত বয়স হবে তোমার ? বারো ? এই বারোতেই যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তাতে টিকলে হয়! আর বারো পর্যন্ত যদি বা বেঁচে বর্তে থাকো, থেকেই যাও, বিরাশী পর্যন্তই পৌঁছবে কিনা সন্দেহ !”

স্নানাহার বাঁচিয়ে এইভাবে বীরের মত তিনি বেঁচে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল।

দুর্ঘটনাটা ঘটল ভোরের দিকেই।

রামরতন ও শ্যামরতন - পিতাপুত্রে শুয়েছিলেন একই শয্যায়—যেমন তাঁদের চিরদিনের অভ্যাস। এমন সময়ে রামরতনের পেটে কী যেন নড়ে উঠল!

নড়ে উঠল, পেটের নেপথ্যে নয়—সটান পাটাতনেই।

বিস্মিত হয়ে রামরতন চোখ খুলে চেয়ে দেখেন —এক বেড়াল শিশু!

বেড়াল দেখেই রামরতন এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। বেড়ালকে বাগিয়ে ধরলেন নিজের মুঠোয়। তারপর তাঁর আস্ফালন দ্যাখে কে!

“—য়্যাঁ ? আমার ঘরে বেড়াল ? মানেই মাছ আর দুধের বরাদ্দ। বেড়াল মানেই খরচান্ত -সর্বস্বান্ত। আমাকে ফাঁক করবার মতলবে এখানে ঢোকা হয়েছে ? বাছাধনের ? বটে —”

সলেজে বেচারাকে ধ'রে সতেজে তিনি ঘুরোতে থাকেন। বেড়ালের সঙ্গে এই মুষ্টি যুদ্ধের অবকাশে, কি করে জানি না, হয়ত সেই ঘুরপাকে মাথা ঘুরে তিনি পড়ে যান। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ পদস্খলন!

অনিবার্য অধঃপতন—কিছুতেই তাঁকে থামাতে পারা গেল না। হয়ত ঘুন্টিদের আশ্রমের থেকে কোনো মহাপ্রভু কলা খেয়ে খোসাটি দয়া করে একাদশীর বাড়ির দিকেই নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই খোসার থেকেই এই দশা। ঘুন্টিদের খোসমোদের দরুনই দারুণ এই পদস্খলন।

মাথায় চোট্ লেগে একাদশী তো অজ্ঞান হয়ে গেলেন : অনেকক্ষণ গেল, অনেক চেষ্টা হ'ল, জ্ঞান আর হয় না। অগত্যা শ্যামরতন ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবটা পাড়ল —"ডাক্তার ডাক্‌ব নাকি?"

শ্যামরতনের মা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন—"সর্বনাশ! তাহ'লে কি আর ওঁকে বাঁচানো যাবে বাবা? ডাক্তার এসেছে, ভিজিটের ফীজ দিতে হবে জানলে ওঁর জ্ঞান আর ফিরতে চাইবে না। তোমার বাবাকে কি চেন না বাবা?"

বাবাকে ভালোই চেনেন শ্যামু! নিজেকে চেনেন তারও বেশি। কাজেই পিতৃহত্যা-পাতকের ভাগী হবার জন্যে তিনি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না।

একাদশী গিন্নি বললেন,—তার চেয়ে এক পয়সার চিনি কিনে আনো বরং। শরবৎ করে একটু খাওয়ালেই জ্ঞান ফিরবে। এক পয়সার,—বেশি নয় কিন্তু!"

পয়সার কথাটা কানে যাবার জন্যেই হয়ত একাদশীর জ্ঞান ফিরল। গিন্নী বললেন,—"এইটুকুন চক্ করে গিলে ফেল দেখি! গায়ে বল পাবে, সেরে উঠবে এক্ষুনি।"

"কী এটা? দুধ?"

"রামচন্দ্র! দুধ দেব তোমাকে? কী যে বল তুমি!" গিন্নী হেসে উড়িয়ে দেন কথাটা।

"তবে কী বেদানার শরবৎ?"

"ছি ছি! অমন কথা মুখেও এন না!" গিন্নী এবার রাগ করেন। বেদনাহত হন যেন। "বেদানা দিয়ে তোমাকে বেদনা দিতে পারি?"

"বার্লি টার্লি নয় তো গো?"

"ভয় খাচ্ছ কেন? তোমার পয়সা জলে দেব তেমন মেয়ে পেয়েছ আমায়? এখন ঢক করে গিলে ফ্যাল দিকিন্। সামান্য একটু জল মাত্র।" গিন্নী অভয় দেন।

"ভরসা পেয়ে একদশী এক ঢোক্ খান—কী রকম জল? কেমন মিষ্টি মিষ্টি লাগছে যেন। জল কি এমন মিষ্টি হয় নাকি? জল তো এ নয় গিন্নী।"

"ও কিছু না। শ্যামু একটুখানি চিনি মিশিয়েছে জলে!" দুঃসংবাদটা তিনি আস্তে অস্তে ভাঙতে চান।

"য়্যাঁ? কী বল্‌লে? কি বল্‌লে গিন্নী? জলে চিনি? এইবার ডোবালে তোমরা। পথে বসালে আমায়! এইবার আমি সর্বস্বান্ত হলুম। জলে চিনি? কী সর্বনাশ! য়্যাঁ? জলে চি-চি-চি "

বলতে বলতে চি চি করেই একাদশী নিজেকে উদ্‌যাপন করলেন।

সেই প্রথম শ্যামরতন বাবুর বাড়ি চিনি এল, কিন্তু চিনির সঙ্গে বাপকেও জলাঞ্জলি দিতে হবে, সামান্য জলযোগ যে এমন বিয়োগান্তক ব্যাপারে দাঁড়াবে একথা শ্যামরতনও ভাবতে পারেন নি কোনদিন। আমরা তো নয়ই।

—দশম পরিচ্ছেদ—

মটর চালে মাত

'করকমের মটর আছেন কন্ তো দেখি?' হর্ষবর্ধন সেদিন এসে শুধোন আমাকে: 'ক কিসিমের মটর দেখেছেন আপনি।'

একটুক্ষণ মগজ হাতড়ে বলি: 'দু রকমের—যদ্দূর মনে হয়।'

'যথা?'

'এক, মটর ডাল। ভাতের সঙ্গে দেখেছি নিজের পাতে। আর দুনম্বর মটর—মটর গাড়ি। চেপে দেখেছি।'

'মটর চালের খবর আপনি রাখেন?' তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'মটর চাল? মটর চালও হয় নাকি আবার?' আমার বিস্ময়।

'হয় না?'

'হ্যাঁ, হয়। হতে পারে।' বলতে বলতে আমার মগজের বুদ্ধি গজায়: 'মটর চেপে লোক দেখিয়ে চাল মেরে খাওয়ার কথাই বলছেন বুঝি? না, তা নয়? তবে কি মটর চালিয়ে মানুষ চাপা দেওয়া? তাও না। তবে কী? কী তাহলে মশাই?'

'একটা সূত্র দিচ্ছি, যদি কিছু তার আঁচ পান···' তিনি জানান।

তাঁর কথার চালচিত্র থেকে কিছুই ঠাওর পাই না। বোকার মত 'কী হয় এই মটর চালে?'

'কী হয় মানে? কী না হয়! এই মটর চালে মাত হতে হয় মানুষকে।' তাঁর বিবৃতি: 'আমিই হয়েছি মশাই!'

'কী করে হলেন শুনি?' ওঁর মাতোয়ারা হবার খবরটা জানার আমার আগ্রহ হয়।

'তাহলে শুনুন—সেদিন কফিহাউসে।…' শুরু হয় তাঁর কাহিনী ঃ 'চৌরঙ্গী প্লেসটায়। কোণের একটা টেবিল খালি পেয়ে গেলুম। দুপুরের ফাঁকে বসে একমনে কফি আর কাজুবাদাম খাচ্ছি, বেশভূষায় সুসজ্জিত এক ভদ্রলোক এসে বসলেন আমার সামনে।'

বসেই বললেন, 'আমার নাম চিত্রক রায়। মটরগাড়ি কেনা-বেচার কাজ আমার…গায় পড়ে আলাপ করলাম, মাপ করবেন!'

'না না। মাপামাপির কী আছে। আমার বেচবার মত কোনো মটর নেই। সত্যি বললে, কোনো মটরই নেই আমার।' আমি বললাম ঃ 'মটর পাওয়া ভারী দুর্ঘট মশাই আজকাল। বিশেষ করে ওই বিদেশী মটর। অর্ডার দিয়ে নাম লিখিয়ে বসে থাকুন তালিকায়। তারপর কবে মটর আসবে, কবে আপনার নাম তালিকার মাথায় উঠবে —থাকুন তার অপেক্ষায়। তারপরভাগ্য প্রসন্ন হলে তবেই আপনরা প্রাপ্তিযোগ।'

'তাতে কী হয়েছে!' কফির হুকুম দিয়ে ভদ্রলোক বললেন আমায় ঃ 'আপনার মতন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকাটাই সৌভাগ্যের। একদিন হয়ত আপনি মটর কিনতেও পারেন, বেচতেও পারেন আরেকদিন।'

'তা পারি।'…জবাব দিই আমি ঃ আজকালের মধ্যেই আমি কিনতে পারি একখানা গাড়ি। সেরকম সুযোগ এসেছে…বলতে কি আজই আমার এজেন্সির থেকে খবর পেয়েছি যে আমার নাম এখন তালিকার ওপরে এবং আমার বুক করা গাড়িটাও এসে গেছে বিলেত থেকে এবারকার চালানে। জাহাজ থেকে খালাস করে আনা হয়েছে। তাঁদের শো-রুমে রয়েছে এখন। আজকালের মধ্যেই নিয়ে ফেলব গাড়িটা। সত্যি বলতে, সেইজন্যেই এইদিকে আমার আসা আজ।'

'বটে বটে! আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। আমার কন্‌গ্রাচুলেশন।'

—'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটাও আমার ভাগ্য বলতে হয়। মটর

গাড়ির কেনা-বেচার কারবার যখন আপনার তখন তাবৎ গাড়ির নাড়ী-নক্ষত্রই তো আপনার নখদর্পণে···'

'তাই কি আর। তবে এই লাইনেই যখন, কিছু কিছু খোঁজখবর রাখতেই হয়। কোন্ গাড়ির বিষয়ে আপনি জানতে চান বলুন ?'

'এই, কন্টুর ? কেমন গাড়ি। ঐটেই বুক করা আমার।'

'ফ্রেঞ্চ গাড়ি তো। খাসা গাড়ি—তবে যদি প্যারিসে গিয়ে কিনতে পারেন। এখানে ওরা কন্টুরের নামে যে গাড়ি পাঠায় তার ভেতর শুধু ঐ নামটারই যা দাম, আর সব রদ্দি।'

'সব রদ্দি।'

'বিলকুল। যে সব গাড়ি লাখ লাখ মাইল পার হয়ে গেছে, গাড়ির কলকব্জা ঝরঝরে হয়ে গেছে—সেই সব খারিজ হাওয়া লঝ্ঝর গাড়িই ওরা এদেশে পাচার করে, তা জানেন ?'

'তাই নাকি ?'

'প্রাচ্যের বাজার হচ্ছে ওদের রদ্দি মাল পাচারের জায়গা। যে সব গাড়ির মা-বাপ নেই, বয়সের গাছপাথরও না—তাদের বডিটা রি-মডেল করে ঝকঝকে পালিশ করে নতুনের মত বানিয়ে বেচতে পাঠিয়ে দেয় এদেশে।'

'ভারী খারাপ তো।'

'খারাপ বলে খারাপ। প্রথম থেকেই বলি, প্রথমতঃ গাড়ির অ্যাক্-সিলেরশন হয় না। তারপর ব্রেক্ খারাপ···।'

'তবে যে বলে ওর চার চাকাতেই ব্রেক্ ?'

ঐ ব্রেকের জন্যেই ব্রোক হতে হবে আপনাকে। আক্‌সিডেন্ট-এ পড়বেন একদিন···'

'কী বলছেন ?

'তাই বলছি। নিজের চোখেই তো দেখলাম সেদিন। চোখের ওপর একটা কন্টুর গাড়ি চুরমার হয়ে যেতে দেখলাম। রাস্তার এক ল্যাম্পপোস্ট-এ ধাক্কা লাগার সঙ্গেই না···সঙ্গে সঙ্গে ছাতু।'

'ছাতু ?'

'আজ্ঞে হ্যা। ছাত থেকে পড়লে যা হয়। সামান্য একটা ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে লেগে তাই হোলো। ওরা বললে গাড়িটা পিছলে গেছল হঠাৎ। বাজে কথা মশাই, ডাহা মিথ্যে। আসলে কোথায় ওর গলদ আমার তো তা অজানা নেই।' গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো লোকটা।

'কোথায় ?'

'ব্রেকে।' তিনি বলে যান ঃ 'নেই বললেই হয়। তাছাড়া বলে তো স্টীলের গাড়ি, বিশ্বাস হয় না। মনে হয় পুরনো কেরোসিন তেলের ক্যানাস্তারায় বানানো। যুদ্ধের পরে বিলেতে এক ছটাক খাঁটি ইস্পাত থাকলে তো !

'বিলেত নয় ফ্রান্স।' শুধরে দেন হর্ষবর্ধন।

'একই কথা।' তিনি কন ঃ 'গোটা কন্টিনেন্টের ওই এক হাল। এক দশা মশাই।'

'তাই নাকি ? আচ্ছা, আপনি এত খবর জানলেন কী করে ?'

'বাঃ, আমি জানব না। আমারই তো জানবার কথা। মটর কেনাবেচাই যে কাজ আমার। আমার সংসার চলে তাইতেই।'

'কনটুর কী রকম পেট্রল খায় বলুন তো ! আজকাল পেট্রল যা আক্রা হয়েছে না !'

'এক নম্বরের পেট্রলখোর গাড়ি। এমন আর দুটি দেখি নি আমি।'

'কী সর্বনাশ !' আমি আঁকুপাঁকু করে উঠি ঃ 'আরেকটু হলেই আমি ডুবতে বসেছিলাম।'

'যা বলেছেন।' উনি বলেন ঃ 'হ্যা, ডুবতেন আপনি। ঐ পেট্রলেই ডুবতেন। ভরাডুবি হোতো আপনার।···পেট্রলখোর, অমন পেটুক গাড়িকে পেট্রল খাওয়াতে হলে আপনার নিজের পেটেই কিছু জুটত কিনা সন্দেহ !'

'ইস্ বড্ডো বেঁচে গেছি তো! ভাগ্যিস্, আজ দেখা হোলো আপনার সঙ্গে। আপনিই বাঁচালেন।'

'আজ্ঞে?'

'বড্ডো বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি। আরেকটু হলেই আমি কিনে ফেলতাম গাড়িটা! কিনতে যাচ্ছিলাম আজকালের মধ্যেই।'

'সে তো গোড়াতেই শুনেছি– বললেন তখন।'

'তাহলে কী করতে বলেন আমায়?'

'একটা মজার কথা বলি শুনুন। জানেন কি, একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কন্‌টুরের দাম নতুনের চাইতে বেশি? অনেক বেশি। অন্ততঃ হাজার তিনেক তো বটেই। নতুন কনটুরের দাম তো? সাতাশ হাজার না? সেকেণ্ডহ্যাণ্ডের দাম হাজার তিরিশ...'

'তা তো জানতুম না।'

'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কনটুর আনকোরার চেয়ে দামী—কিনতে গেলে বেশি দর। এই থেকেই বুঝবেন। নতুন কনটুরের কদর এর থেকেই টের পাবেন আপনি।'

হর্ষবর্ধন কিছু আর কন না। মুহ্যমান হয়ে টের পেতে থাকেন। 'আচ্ছা, এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

'আছে বই কি। আরো কয়েক হাজার টাকা ঐ গাড়ির পেছনে খর্চা করলে একেবারে নতুনের মত বানিয়ে নেওয়া যায়। আক্‌সিলে-টারটা পালটানো, ইঞ্জিন রিনোভেট করা, ব্রেকগুলি বাতিল করে সেই জায়গায়...তবে হ্যাঁ, মটরের বডিটা বদলাবার কিছু নেই। কোনো খুঁত নেই ওর। বডিটা ঠিকই আছে। সত্যি চমৎকার চেহারা গাড়ি-খানার সে কথা বলতে হয়। দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর সেই দেখেই তো লোকে পাগল! বড়লোকের যত আনাড়ি ছেলে তাইতেই তো মজছে।'

'অত দাম দিয়ে গাড়ি এত পার্টস্ পালটালে আর সুবিধেটা কী হোলো?'

'সুবিধে এই, খোল নলচে দুইই পালটাতে হল না – খোলাটা ঠিকই আছে। কেবল ভেতরের ঐ নলচেগুলি অদলবদল করে নিলেই··· আমার খোলাখুলি কথা মশাই!'

'অনেক টাকা ধাক্কা যে মশাই!' হর্ষবর্ধন বলেন: 'সাতাশ হাজারের ওপর আরো সাত হাজার খর্চা করেও কূল পাব কিনা কে জানে!'

'যা বলেছেন! তবে অতো কাণ্ডর মধ্যে না গিয়ে একটা চালু কনটুর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনুন না কেন—হাজার দু-তিন বেশি দিয়ে। আমি তাই কিনতেই বলি আপনাকে।'

'পাচ্ছি কোথায়? একটা গাড়ি না হলে যে চলছে না। না, আমার জন্যে নয়। আমি তো নিজের কারবার নিয়েই ব্যস্ত—আমার কাঠের কারখানাতেই পড়ে থাকি দিনরাত। গাড়ি আমার জন্য নয় ঠিক···'

'বুঝেছি। আপনার শ্রীমতীর জন্যই বুঝি?'

'শুধু শ্রীমতী? শ্রীমতীবৃন্দ। শ্রীমতীর অভাব নেই—আমার বাড়ী এখন বৃন্দাবন—দেশ থেকে শ্রীমতীর বোন বোনাইরা এসে হাজির হয়েছেন বড়দিনে বেড়াতে কলকাতায়।'

'তা অতো ঘাবড়াচ্ছেন কেন? সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কনটুরই আপনাকে আমি পাইয়ে দেব। বেশ চালু গাড়ি। দেখতেও চমৎকার। আনকোরা নতুনের মতই পাইয়ে দেব আপনাকে। ভাববেন না। আছে আমার সন্ধানে।'

'দেবেন? আঃ, বাঁচালেন আপনি আমায়। খালি ঐ কনটুরের হাত থেকেই না, ঘরের কনের আর কনের বোনেদের হাত থেকেও উদ্ধার করলেন আমাকে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।'

কফিহাউস থেকেই তারপর তিনি সোজা চলে গেছেন তাঁর এজেন্ট-দের আপিসে।

ম্যানেজার তাঁকে দেখে সহাস্য হয়ে উঠেছেন—'আপনার গাড়ি—'

'না মশাই, আমার চাইনে। কনটুরের যে অর্ডার আমার বুক

করা ছিল তা আমি ক্যানসেল করে দিলাম। যাকে খুশি বেচতে পারেন এখন।'

'অ্যা?'

'হ্যাঁ। এক্ষুণি। ও গাড়ি আমার চাইনে আর।'

ম্যানেজার অবাক হন। কিন্তু বেশি কথা বাড়ান না। বাক-নিষ্পত্তি হয় বাড়ি ফিরে। উনি কন্‌টুর বর্জনের বার্তা প্রকাশ করতেই তস্য বোন, তস্য বন্ধুরা, তস্য তস্য বোনাইবৃন্দ তাঁকে এসে ছেঁকে ধরে। এতদিন ধরে এ হেন শুভদিনের অপেক্ষায় বসে থাকা—এখন কর্তা এসে কিনা একেবারে বসিয়ে দিলেন!

কুরুক্ষেত্রের পর পাণ্ডুপক্ষও আসতে থাকে একে একে। হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা গোবধন—তস্য মাস্তুত পিস্তুত পাতানো পাড়াটে যত ভ্রাতৃবৃন্দ—এবং দূর অদূর সম্পর্কের রাঙামামা, সেজ পিসে, বড়ো জ্যাঠা তাঁরাও সব হন্তে হয়ে আসেন। তাঁদেরও ঐ গাড়ি নিয়ে কতো প্লান আঁটা ছিল। কিন্তু হায় ঐ রকম মটর অবহেলায় উনি তালাক দিয়ে এসেছেন। সাতাশ হাজার টাকায় অমন গাড়ি পাওয়া—এমন বরাত কেউ ছেড়ে দেয়! বেশি টুরের জন্যও—কম টুরের জন্যও। ঐ কন্‌টুর!

ফলে আবার টুর দিতে হল হর্ষবর্ধনকে! স্থড় স্থড় করে গেলেন আবার তিনি সেই মটর কোম্পানি কার্যালয়ে।

'দেখুন মশাই, ঘণ্টা কয়েক আগে যে গাড়িটা বাতিল করে গেলাম না?' ম্যানেজারের কাছে তিনি কাঁচু-মাচু হয়ে শুরু করেন—'সেটি আমার চাই। আমি আমার মত বদলেছি।'

'ট্যু লেট্। মশাই, ট্যু লেট্।'

'ট্যু লেট্?'

'হ্যাঁ, বড্‌ডো দেরি করে ফেললেন আপনি। ঐ দেখুন আপনার গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে স্টার্ট দিতে যাচ্ছে।'

তাকিয়ে দেখলেন তিনি। চেহারা দেখে চোখ ফেরাতে পারেন

না। 'বড্ডো দেরি হয়ে গেল কেন? এই তো আমি ঘন্টা কয়েক আগে'

'হ্যাঁ, আপনার যাবার পরেই আরেক ভদ্রলোক এসে সেটা কিনে ফেলেছেন। এই মিনিট পনের আগেই তো। আপনার পরেই তাঁর নাম ছিল আমাদের তালিকায়।'

'ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারেন না?' তবু বলতে যান হর্ষবর্ধন।

'তা কী করে হয়? উনি আমাদের বহুকালের খদ্দের। আমাদের সব লিস্টেই সব সময়ই নাম বুক করা থাকে ওঁর—সব রকমের বিদেশী মটরের। ভারী মটর কেনার বাই ভদ্রলোকের। এরকম মটরের মন দেখি নি আর।'

হর্ষবর্ধন এগিয়ে যান গাড়িটার কাছে। অন্তর্গত ভদ্রলোককে স্টীয়ারিং ধরে বসে থাকতে দেখেন। গাড়ির থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি বলেন···

'আপনি কিনতে চান গাড়িটা? হাজার দু-তিন বেশি দিলেই দিয়ে দেব আপনাকে। কিনুন না, বাধা কী? একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কন্‌টুরের দাম আনকোরার চেয়ে একটু বেশি—বলেছিলাম না আপনাকে?'

—একাদশ পরিচ্ছেদ—

কনের অনেক কোণ

বিয়ের যা ব্যবস্থা করার প্রিসিলাই করছিল। রবিকে কোনো ট্যাঁ ফোঁ করতে দেয় নি তার ভেতর।

কিন্তু শেষ অব্দি রবি না বলে পারল না, 'প্রিসি, এর মধ্যে এত ব্যবস্থা করার কী আছে? করার মধ্যে তো খালি এই যে আমরা দুজনে একসঙ্গে রেজিস্ট্রি আপিসে যাব—পাশাপাশি দাঁড়াব—'

'রেজিস্ট্রি আপিস?' প্রতিধ্বনি করে প্রিসিলা।

'রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে দাঁড়াব দুজনে। সেখানে দু-একটা কাগজে আমাদের সইপত্তর করতে হবে—শুধু এই। আর কী একটা শপথ-বাক্য উচ্চারণ। আর পত্রপাঠ বিয়ে। অবশ্যি তোমার মেজমামাও আমাদের সাথে থাকবেন।'

'মেজমামার নিকুচি করেছে! মেজমামা আবার এর মধ্যে কেন?' প্রতিবাদের ঝামটা দেয় প্রিসিলা। 'শোনো রবি, তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে রাখি, ভালোই করি আর মন্দই করি, ভুলই হোক আর সঠিকই হোক, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তোমাকে তোমার আত্মীয় কুটুমদের নয়। এই বিয়ের ভেতরে তোমার কি আমার মেজমামা কি মেজকাকা, কাউকে আমি নাক গলাতে দেব না।'

'বেশ তাই হবে।' রবি বলে: 'এর জন্যে তোমার মাথা গরম করতে হবে না। তোমার উপরেই তো সব ছেড়ে দিয়েছি আমি। বলতে গেলে আমি একটি লাজুক বর বইতো কিছু নই।'

'আমি সেকথাই বলি।' সায় দেয় প্রিসিলা: 'বিয়ের ব্যাপারে

কনেই হোলো গিয়ে আসল। কনে না. হলে তো বিয়েই হয় না। কনের প্রয়োজনেই বর।'

'সব সময়ে নয়।' রবি বলতে যায়ঃ 'সব সময়ে প্রয়োজন বলেই নয়। বর কখনো কখনো বা প্রিয়জনও হতে পারে।'

'ইস্! আমার মেজমামার মত কথা বলতে শিখেছ দেখছি! অবশ্যি বর ছাড়াও আছে বিয়ের ব্যাপারে তারও প্রয়োজন। নিতবর রয়েছে।'

'নিতবর! নিতবরের কথা আমার মনেই ছিল না একদম। বেমালুম ভুলে গেছি।'

'ভুলে বসে আছো? বেশতো! বাঃ, সব কিছুই কি আমার মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি? কদিন ধরে শাড়ি ব্লাউজ কেনাকাটায় আর গয়নার প্যাটার্ন দেখে দেখে নিশ্বাস ফেলার আমার ফুরসত নেই; তার উপর আবার নিতবরও যদি আমায় খুঁজে বের করতে হয় তবেই হয়েছে। বেশ তো! বেশ বলছ তো তুমি।'

'না না, তুমি কেন খুঁজবে! আমাদের ক্লাবের থেকে কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখছি। নিতবর একেবারে বাচ্চা হতে হবে এমন তো কোনো মানে নেই? আমার চেয়ে বয়সে একটু ছোট হলেই হবে, এই তো?' রবি মাথা চুলকায়।—'কিন্তু ক্লাবে এখন কাকে পাই?'

'রেজিস্ট্রি বিয়ের ভোজ টোজ নেই বলে কেউ আসতে চাইবে না বোধ হয়।'

'হ্যাঁ, তাও তো বটে। তাহলে রেজিস্ট্রি বিয়ের নিতবরও তো লাগে না যদ্দূর জানি।' রবি জানায়ঃ 'তবে হ্যাঁ, একজন সাক্ষীর দরকার হয়ে বটে।'

'একজন সাক্ষী কেবল? তাহলে তো আমাদের গোপালই হতে পারে।' প্রিসিলার মুখে শোনা যায়।

'গোপাল?' রবি শুধোয়ঃ 'এই সাক্ষীগোপালটি কে শুনি?'

'গোপাল আমাদের পাড়ার ছেলে। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। স্মার্ট, চৌকস, চোখা, চোখে-মুখে কথা। ওর সঙ্গে আমার

অনেকদিনের ভাব। গোপালের মতন ছেলে আর হয় না। আমি বললেই সে জারী হবে।'

'না না। গোপাল-টোপালের দরকার নেই।' গোপালের কথায় রবির চোখে ভ্রূকুটির মেঘ দেখা দেয়। নাড়ুগোপাল বলে একটা কথা থাকলেও গোপালের কথাটা তার কাছে ঠিক নাড়ুর মতন মিষ্টি ঠেকে না।—'আমি আমার ক্লাবের থেকেই যাকে হয় যোগাড় করে নেব। একটুক্ষণের সাক্ষী দেওয়া। একটা সই করা কেবল তো। এক-জন সাক্ষীই কেবল।'

প্রিসিলার সঙ্গে আমরণের সেতুবন্ধে, জীবনভোর ব্রীজ খেলায় তার হার্টের কারুর চেয়ে নিজের ক্লাবের ডাকেই সে সাড়া দেয়। হার্টের কারুর চেয়ে ক্লাবের কাউকে সে ঢের বাঞ্ছনীয় বোধ করে।

বাড়ি ফিরে সে ভাবতে বসল ক্লাবের থেকে কাকে ফেলে কাকে বেচে নেয়া যায়।

এমন বিদঘুটে সব ছেলে তাদের ক্লাবের যে তাদের নিয়ে বরযাত্রী তো দূরে থাক, শ্মশানঘাটে মড়া পোড়াতে নিয়ে যেতেও ইচ্ছে করে না, তাদের সাথে লোকচক্ষে সর্বসমক্ষে ধরা দিতেই কেমন লজ্জা লাগে।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনজনকে সে ঠিক করল। তমু চৌধুরী, পলাশ রায় আর তিমির বসু। এদের একজনকে বেছে নেবে।

ক্লাবে ঢুকে প্রথমেই সে তমুর কাছে গিয়ে পাড়লো কথাটা—তোমাকে একটা কথা বলবো তমু?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' বলে উঠল তমু - 'বলো না, কতো চাই? ক টাকার দরকার তোমার? কোনো কুণ্ঠা কোরো না।'

'না না। টাকার আমার দরকার নেই। অন্য দরকারে এসেছি, শোনো আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। রেজিস্ট্রি বিয়ে। তুমি তার সাক্ষী হবে।'

'তাই বলো! প্রিসিলার সঙ্গে বুঝি?' বলে তমু চোখ মটকালো: 'তোমাকে বলতে বাধা নেই রবি, একদিন ঐ মেয়েটির ওপর আমারও একটু ঝোঁক ছিল। সেবার পুরী বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রের ধারে আমাদের

আলাপ হল প্রথম। আমরা দুজনে একসঙ্গে সাঁতার কাটলুম। যে ক'দিন পুরীতে ছিলুম, একসঙ্গে বেড়াতুম আমরা। আহা, অমন মেয়ে হয় না রবি, অমন মেয়ে আর হয় না।...হ্যাঁ, কী বলছিলে? হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমাদের বিয়ের আমি সাক্ষী হব বইকি। চাই কি, প্রীতি-ভোজও দেব তার ওপর।' উপরন্তু সে জানায়।

'বহুৎ আচ্ছা।' বলে রবি সেখান থেকে সরে পড়ে। পলাশকে গিয়ে পাকড়ায়।

'কে প্রিসিলা?' প্রশ্ন করে পলাশ: 'কোন এক লেখকের ভাইঝি না ভাগনি—সেই তো? আহা, তাকে যে আমার নিজেরই বিয়ে করার সাধ ছিল হে।'

'অ্যাঁ? শুনেই চমকে ওঠে রবি।

'কেন বলি নি তোমায়? আদ্রা জংশনে ডাউন ট্রেন মিস করে এক আর্দ্র সন্ধ্যার হার্দ্য পরিবেশে ওয়েটিং রুমে কত আনন্দে আমরা কাটিয়ে ছিলুম—বলি নি সে কথা তোমাকে?'

'ওতেই হবে।' বলল রবি। 'আর বলতে হবে না।' বলেই সরলো সেখান থেকে।

রবির তালিকায় আর একজন কাটা পড়লো। রইলো মাত্র এক। তিমির বোস।

প্রস্তাবটা তিমিরের কাছে পড়তেই সে বলল—'বিয়ের সাক্ষী হতে বলছ, বটে? কিন্তু তাতে আমার লাভ? সাক্ষী হয়ে আমি পাবোটা কী?' বলতে বলতে তিমিরের দুই চোখ বুজে আসে; তিমি-র মতো বিরাট একটা হাঁ দেখা দেয়—নিমীলিত নেত্রে অভিভূতের মত সে বলতে থাকে—'আহা! কী মেয়ে, কী ফিগার! কেমন স্মার্ট! তিলোত্তমা কোথায় লাগে। প্রিসিলার কথা মনে হলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই। অমন মেয়ে আর হয় না...।'

তার চোখ খোলার আগেই, তিমিরকে তার নিজের তিমিরের মধ্যে রেখেই রবি সেখান থেকে কেটে পড়ে।

কেটে প'ড়ে প্রিসিলার কাছে গিয়ে ওঠে—'তোমার সেই গোপাল-কেই ছ্যাখো তাহলে। ক্লাবের কাউকে পাওয়া গেল না। কী করা যাবে?'

'সাক্ষীর জন্যে তুমি কিছু ভেব না। গোপালকে আমি বলে রেখেছি।' জানালো প্রিসিলা। কালকেই বলেছি।'

'বলেছ? এর মধ্যেই বলেছ? শুনে সে কী বললে?'

'শুনে সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলব কি, সে কিছু বলতেই পারল না।'

'বলো কি, কিছুই বলতে পারলো না?' অবাক হল রবি।

একটা কথাই সে বার বার বলতে লাগল, প্রিসি, তুমি বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। হায়, হায়। আমাদের পাড়ার সব আলো নিভে গেল। গোটা পাড়ার ইলেকট্রিক লাইন ফিউজ! অন্ধকার হয়ে যাবে আমাদের এলাকা—তুমি চলে গেলে। এই কথাই সে বলতে লাগল বারবার।'

'এই কথাই?'

'কাল রাত্তিরের শো'য়ে সিনেমা থেকে ফেরার কালে সারা পথ তার শুধু এই এক কথা। এ ছাড়া কথা নেই।'

—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—

অদ্‌ভৌতিক

'ভগবানে বিশ্বাস করেন ?' আস্তিক্যবোধের এই জিজ্ঞাসাটা শরৎ চন্দ্র (কি, তাঁর কোন নায়কের কাছে কে যেন রেখেছিল একবার।) তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, ভূতে বিশ্বাস করি আর ভগবানকে করব না ? বলেন কি মশাই ?

কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায় বোধ হয়, ভগবানে কোনো আস্তা না থাকলেও ভূতের ওয়াস্তা রাখতেই হয়। স্বয়ং তিনি যাই হন না, কখনই ভয়ংকর নন, কিন্তু ভূত সেদিক দিয়ে নিদারুণ। রীতিমতই মারাত্মক, সন্দেহ কি !

সম্প্রতি তারা প্রণব বাবুর 'অবিশ্বাস্য' বইটি হাতে পেয়ে (এই চমৎকার কাহিনীগুলি আগেই বিভিন্ন পত্রিকায় পড়া ছিল আমার) আমার জীবনের সেই প্রায়ান্ধকার দিকটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সহসা যেন ঝিকমিকিয়ে উঠল। আর, তার আলো আঁধারির যবনিকা ঠেলে কয়েকটি ছায়াশরীরী ভেসে উঠল যেন আমার সামনে······তারা প্রণবের প্রেরণায় উজ্জীবিত এই সিরিজে তারই একটি কাহিনী আজ উপস্থিত করলাম······

গোড়াতেই বলে রাখি, এটা হাসির গল্প নয়। কেননা, ভূত দেখা আর যাই হোক, হাস্যকর ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই।

এবং এও বলা দরকার যে, এটা গল্পও নয়। আনকোরা সত্য ঘটনা। ভূত দেখার মতো সত্য ঘটনা, সত্যিকারের দুর্ঘটনা আর কী আছে ? যাঁরাই ভূত দেখেছেন, আমাদের মধ্যে অনেকের জীবনেই

হয়তো এই দুর্যোগ ঘটে থাকবে, তাঁরা সবাই এক বাক্যে আমার সাক্ষ্য দেবেন।

ভূতের গল্প মানেই সত্যিকারের গল্প।

অবশ্যি, এতে বলতে চাই, এক জীবনে অদ্ভুত আমি অনেক কিছুই দেখেছি, এবং এখনও দেখতে হচ্ছে, কিন্তু ভূত আমি সেই একটিই—বা একসঙ্গে সেই দুটিই—যা একবার দেখেছিলাম।

বিনি আর আমি বাড়ির খোঁজে বেরিয়েছি, পুরোনো বাসায় মন টিকছে না। নতুন একটা আবাস দেখে উঠে যাব, এই বাসনা। এক জায়গাতে কতদিন আর মাথা গোঁজা যায়? খাঁচার পোষা জানোয়ার-দেরই পোষায় কেবল। চোর-ছাঁচোড়রা নাওটা না হলেও, চামচিকেরা এসে আড্ডা না গাড়লেও, কাঁকড়াবিছেরা যখন তখন যেখানে সেখানে দেখা না দিলেও, আর্সোলারা ফর ফর আর ধেঁড়ে ইঁদুররা ধর ধর করে ঘরময় না ঘুরলেও, তেমন কিছু অনিষ্ট না ঘটলেও, এক জায়গায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকাটা—এমনিতেই কেমন খারাপ লাগে না কি? ভাড়াটে বাড়ি আঁকড়ে, মাটী কামড়ে পড়ে থাকা একটু বাড়াবাড়ি দেখায় না? পৈতৃক ভিটে নয় কিছু, পরকে টাকা গুণে পরের বাড়িতে তৎপর হয়ে থাকব—অতটা পরার্থপর হওয়া কি ভালো?

সেদিন সকালে বিনি, অকারণেই কলতলায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এবং উঠেই বল্ল, প্রথম কথাই বল্ল সেঃ

"এই আস্তাবলটা এবার ছাড়ো তো বাপু!"

"এই আস্তানাটা এবার বদলানো দরকার। বহুদিন তো কাটল!" আমিও ওর হ্রেষাধ্বনিতে যোগ দিয়েছি। তার একটু আগেই বিছানায় কালির দোয়াতটা উলটেছিলাম, কাজেই আমার সহানুভূতির অভাব ছিল না। এবং তারপরেই আমরা তীরবেগে রাস্তায় পড়ে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি।

কিন্তু মনের মত বাসা আর পাই কই? 'টু লেট' দেখলেই এগিয়ে

যাই, খানিকক্ষণ লটকে থাকি, তারপরে আরো একটু বেশি দেখে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে হয়।

'টু লেট' তো চারিধারেই ছড়ানো, অনেক বাড়িতে ভাড়াটে এসে জুটলেও ছাড়ানো হয় নি। নতুন বাসিন্দারাই নড়াতে চায়নি, ভাড়া করার দ্বিতীয় দিনেই, কড়ার করে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিয়ে রেখেছে। কড়া নোটিস।

পয়সা খসিয়ে ইট কাঠ বসিয়ে এসব কি বানিয়ে রেখেছে এরা ? জমির ওপর এ সব কী জমিয়ে রেখেছে ? দেখে দেখে বিরক্ত ধরে গেল। এদের এইসব অট্টালিকাদের ধরাশায়ী করাবার জন্যেই, অনতিবিলম্বে বড় গোছের ভূমিকম্প কিংবা এয়ার রেড একটা কিছু হওয়া দরকার।

অবশেষে, বেহালার দিকে একটা ভালো বাড়ির খোঁজ পেলাম। আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই নাকি বাড়িটি ! অল্প কখানি ঘর নিয়ে, ছোট্ট-খাট্টর মধ্যে, অথচ ভাড়াও বেশী নয়, এমনকি তার এক-তলার ঘরগুলোও তালাক দেবার মত না। তালা দিয়ে না রেখে ব্যবহার করার মতো। সামনে একটু লনের মতও রয়েছে নাকি !

খবর পেয়েই ছুট দিলুম। বিনি আর আমি।

খবরটা উড়ে এলেও একদম উড়ো নয়। অনির্বচনীয় না হলেও, পছন্দসই সত্যই। আশপাশ থেকে এ-কোণ ও-কোন থেকে, নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে উপাদেয় বলেই বোধ হোলো বাড়িটাকে। বার থেকে তো ভালোই, এবার ভেতরে পা বাড়িয়ে দেখি।

বাড়িওলার ছেলে এসে সদরের তালা খুলে দিলে। তালার ওপর ধুলো জমে রয়েছে। মাথার চৌকাঠে মাকড়সার জাল লাগানো। দেয়ালে দেয়ালে চটা ওঠে যাওয়া সারা বাড়ির আষ্টে-পিষ্ঠে কী একটা সাবেক কালের ছোপ—কেমন যেন একটা প্রত্নতত্ত্বের ছাপ মারা !

"পোড়ো বাড়ি নয়তো দাদা ?" বিনি খুঁৎ খুঁৎ করে।

"না না ! কী বলছেন ?" ছেলেটি প্রতিবাদ জানায় ঃ "চেষ্টা করা

হয়েছিল, কিন্তু পোড়ে নি। তাহলে তো আমরা ইন্সিওরেন্সের টাকা-গুলো পেতাম। বেশ মোটা টাকা!"

"য়্যা, কী বল্লে?" আমি বিচলিত হই।

"দমকলওয়ালারা এসে পড়ল কিনা।" ছেলেটি অভিযোগ করে। কিরকম একটা আধপোড়া ধরা গন্ধ বাড়িটার গা থেকে এসে আমাদের নাকে ধাক্কা মারে। পুরনো ফিকে, কী জাতীয় একটা বিজাতীয় কেমন গন্ধ!

"কদ্দিন ভাড়া হয় নি, য়্যা?" আমি জিজ্ঞেস করি: "আগের ভাড়াটেরা উঠে গেছে কদ্দিন?"

"তা বেশ—বেশ অল্প কিছুদিন।" ছেলেটি থেমে থেমে বলে।

"অল্প কিছুদিন? বলো কি? দরজায় মাকড়সার ওড়না বসানো দেখচি যে?"

"কী বলচেন?" ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ করে তাকায়।

"মাথার ওপর মাকড়সার জালিয়াতি দেখচি!" আমি সহজ করে বলি এবার। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজীতে, পরিষ্কার করে মানে করে দিই: "দে হ্যাড ফোর্জড য়্যাহেড!"

যাক ভেতরে তো পা বাড়াই।

ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে আসে না। বলে: "আমার ইস্কুলের টাইম হয়ে যাচ্ছে।"

"কতো আর দেরি হবে? ঘরগুলো একবার ঘুরে ফিরে দেখা বইতো নয়!" আমি ওকে অভ্যর্থনা করি। "এসো এসো! চলে এসো?"

"আমি বাইরে আছি। বেশ আছি।" ছেলেটি আমাদের প্রেরণা ছায়: "যান না, ভয়কি? এখানেই তো আছি।"

দরজা খুলে মাকড়সার জালনা ভেদ করে ভেতরে তো ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম, যে লোকটা খবর দিয়েছিল, নেহাৎ মিথ্যে বলে নি! পাকা সিমেন্ট করা। নীচের ঘরগুলো পর্যন্ত চমৎকার! সামনের লনে দিব্যি ব্যাড-মিণ্টন চলবে। ধুলো-বালি ঝেড়েঝুড়ে ধোলাই করে নিতে

পারলে খাসাই হবে। বাড়িখানি বেশ। ভাড়াও বেশী নয়। কলকাতার বুকে এসে একেবারে রাজযোটক!

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠা গেল।

এবং উঠেই যা দেখলাম—সে এক দৃশ্য!

সামনের ঘর থেকে দুটি যুবক—হৃষ্টপুষ্ট দুটি যুবক--যদিও সে সময়ে তারা যে খুব হৃষ্ট ছিল হলপ করে একথা বলা যায় না—হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল—হুটোপাটি করতে করতেই বেরিয়ে এল। দুজনের মধ্যে সে কি হাঁচোর পাঁচোর ধস্তাধস্তি আর আছড়া আছড়ি! পরস্পরের ধাক্কা সামলাতেই দুজনে বারান্দায় গিয়ে পড়েছে—একেবারে কাঠের রেলিংটার কাছ ঘেঁষে বারান্দার ধারটায়।

এ ওকে কিলোচ্ছে, সে তাকে কিলোচ্ছে। যে যাকে পাচ্ছে, বেকসুর কিলিয়ে নিচ্ছে! দুজনের মধ্যে সে কী তুমুল সংগ্রাম।

অতখানি বীরত্বের চোট সামান্য কাঠের রেলিং সইতে পারবে কেন?

সেই মুহূর্তের কাঠের গণ্ডী ভেঙে দুজনেই—দুজনাই—তারা—দারুণ তাল ঠুকতে ঠুকতে—কোথায় আর? কোনো গতিকে কাঠের রেলিং-এর-মায়া একবার কাটাতে পারলে কোথায় আর যাওয়া যায়? সোজা নীচের দিকে, অধঃপতনের পথে, সিমেণ্ট দিয়ে শানানো একতলার উদ্দেশেই সটান পথে রওনা হয়ে গেছে। ততক্ষণে তাদের চিহ্নমাত্রও নেই—অন্ততঃ বারান্দার ওপরে তো নেই! তাদের তখনকার চোখ-মুখের সেই ভীতি-বিহ্বল চিত্র এ-জীবনে আমি ভুলতে পারব না।

এত কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের সামনেই—আমার আর বিনির চোখের ওপরেই!

এবং একেবারে নিঃশব্দে ঘটে গেল!

বলাবাহুল্য, ওরকম একটা দৃশ্যের পরে ও বাড়িতে আর ওঠা চলে না। ভূতে ভূতে কিলোচ্ছে, এরকম দেখতে পাওয়া সচরাচর দুর্লভ, খুবই বিরল, তাতে ভুল নেই; কারণ, শোনা যায় এবং দেখাও গেছে (নিজের কানে এবং অন্যের চোখেই)—যে, ওরাই অপরদের, যারা

ভূত না তাদের ধরে পাকড়ে মজা করে পিটিয়ে নেয়। খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে পড়া যায় বইকি !

তবু দর্শনীয় হিসাবে যতই উপভোগ্য আর অভূতপূর্ব হোক কেন, সেই দুমূর্ল্য বিলাসিতা করতে গিয়ে কে ওদের কিলাতিশয্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে ? তাছাড়া, বিনি আমাকে বুঝিয়ে দিল, এমন তো হতে পারে, ওরা ষড়যন্ত্র করে একটা সন্ধি সূত্রে এসে, অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে কিংবা বেওয়ারিশ বিবেচনায়, আমাদের দু'জনকে শতকরা পঞ্চাশের আধাআধি বখরায় নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা করে নিতে পারে। ভাগাভাগি করে বিনে পয়সায় পিটিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই অবশ্যি। সেই মারামারির মধ্যে গিয়ে পড়া কি আমাদের উচিত হবে ?

এবং আমিও বিনিকে বুঝিয়ে দিলাম, সে রকমটা হলে 'মারামারি' আর হবে না। 'কেননা, ভূতকে মারা আর যার দ্বারাই হোক আমায় দিয়ে অন্ততঃ হবার নয়। নিজের ক্ষতির ভয়ে নয়, ভূতের প্রতি মমতায় নয়, এবং কেবল যে আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত ; তাই বলেও নয়, তবু আমাদের দুঃসাহসের একটা সীমা আছে তো ! অতএব ওটা কেবল একতরফা, ভূতের জবানি হতে বাধ্য। একচেটে 'মারী' হবে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এবং স্বচক্ষে যা দেখা গেল, যে-রকম এক-রোখা চলতে থাকবে, তাতে 'মহামারী' তো বটেই !

অতএব বাড়ি বদলানো আর হোল না। সেই দুর্ঘটনার পর অপর কোন অচেনা আড়তে ওঠা আমাদের সাহসে কুলালো না। কোথায় গিয়ে ফের কিম্বিধ ভূতের নিদর্শন পাবো, কে জানে! যেখানে আছি সেই ভালো ! পুরোনো কোটরেই পুনর্মূষিক হয়ে পড়ে থাকলাম। এই সাবেক আড্ডাটার সুবিধে এই (যেটা নতুন করেই আমাদের চোখে পড়ল) এখানে আশেপাশে যে দু'একজন অবাঞ্ছনীয় রয়েছেন, তারা নিতান্তই জলজ্যান্ত, এবং জানাশোনার ভেতরে ; এখন পর্যন্ত, এত-দিনেও একটি মৃত ভূতের সাক্ষাৎ আমরা পাই নি। এবং বিনির

বিবেচনায় (আর আমারও ঐ মত), মৃত ভূতেরাই বেশী ভয়াবহ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ইতিমধ্যে বিনি একদিন সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছে, এবং এক রাত্তিরে আমি—আমি নিজেও খাট থেকে পিছলে গেছি, আর ছোটখাট হোঁচট তো লেগেই আছে, চলতে ফিরতে ছোটখাট ঠোকাঠক্করও কম খাচ্ছি না ; এছাড়া আছাড়ের তো কথাই নেই। তবু অখাদ্যের এত বাড়াবাড়িতেও, বাড়ি বদলানোর নাম কেউ মুখেও আনি নি। এইসব সত্বেও চমৎকার শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করা যাচ্ছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

"আমি, আমি লালায়িত রায়—একজন লেখক।" বল্লেন তিনি।

লোকটিকে, লেখকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হয়!

"আমি আসছি বেহালা থেকে। 'আবছায়া' নামক পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে। 'আবছায়ার' নাম শুনেছেন নিশ্চয় ?"

"আবছায়া ? শোনা শোনা বলেই মনে হচ্ছে তো! তা, কী দরকার বলুন।"

"আজ্ঞে, আবছায়া-সম্পাদক তুষানল ভট্ট - যিনি একাধিক বই লিখেছেন—"

"হ্যাঁ, জানি। ভট্ট মশায়ের নাম শুনেছি। এক-আধখানা পড়েও থাকব। খুব অখাদ্য লেখেন না ভদ্রলোক।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালোই লেখেন। আমার চেয়ে ভালো না হলেও খুব মন্দ নয়। তাঁর কাছ থেকেই আসছি, এবং আমার নিজের কাছ থেকেও বটে। আমরা দুজনেই 'আবছায়ার'—কি বলে গিয়ে—সৃষ্টি-কর্তা এবং রক্ষাকর্তা একমাত্র আর অদ্বিতীয়।"

"তা, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কী কারণে আসা ? আমি কি করতে পারি, বলুন ?" এবং আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিই : সম্পাদকতা আমি পারিনে।"

"না না না, সেজন্যে নয় এবং লেখার জন্যেও না। আমরা, আমরা

আপনার কাছে লেখা-টেখা চাইনে, ভয় নেই, ছোট্ট একটু কাগজ, আমাদের নিজেদের লেখা ছেপেই কুলিয়ে উঠতে পারছিনে, তবে-তবে কিন্না—" বলতে বলতে উনি থেমে যান।

কিছুটা তখন আমি আশ্বস্ত হয়েছি: "তাহলে আর ভয় কি? বলুন। বলে ফেলুন!" ওঁকেও তখন ভরসা দিয়ে দিই।

"আজ্ঞে, আমরা আপনাকে একটা টিপার্টি দিতে চাই। খুব ছোট্ট একটা টিপার্টি তার নিমন্ত্রণ করতেই আমি এসেছিলুম। আপনার সুবিধামত একদিন, যেদিন আপনি বললেন, আমাদের ওখানে গিয়ে দয়া করে যদি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ "

জলযোগের আবাহনে কে না কাবার হয়? আমি একটু কাৎ হলুম।

"তা, কে কে থাকবেন সেই পার্টিতে?" আমি জিজ্ঞেস করি, "নামকরা লেখকদের আর কেউ?"

"তাঁদের অনেকেই আমাদের করা হয়ে গেছে। তাঁদের খতম করেই আপনার কাছে এসেছি। এদিন কেবল আপনি আর আমরা। আমরা, মানে সম্পাদক তুষানল বাবু, আর আমি। আমি হচ্ছি আমাদের 'আবছায়া'র সহকারী-সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক থেকে স্ত্রীটহকার পর্যন্ত সব। গুপ্ত কথাটা আপনাকে বলতে আর দোষ কি? আপনি তো আমাদেরই একজন!"

"তা বেশ। আমরাও জন-দুই যাব। আমি আর বিনি। ওঃ বিনি? বিনি আমার ছোট বোন।"

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ের কিছু আগেই, বিনি আর আমি বেহালায় গিয়ে পৌঁছলাম। অনেক যুঝে ঠিকানা খুঁজে বার করা গেল।

য়্যা, এ যে সেই বাড়ি! সেই মারাত্মক বাড়াবাড়ি সার রেলিং ভেদ করে একদা নীচে নেমে গেছল, সেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি বাড়িই যে!

দরজার মাথায় 'আবছায়া কার্যালয়', সাইনবোর্ড লটকানো, এবং তার পাশেই সিনেমার লম্বা-চৌড়া বিজ্ঞাপন মেরে গেছে:

একে বিনি সারা রাস্তা পাশাপাশি 'তুমি ভুল করো না পথিক।' গুন গুন করতে করতে এসেছে, তার ওপর ভূতপূর্ব সেই বাড়ি আর তার গায়ে সাটা এই বিজ্ঞাপন—সাবধানাত্মক এই বাণী—দেখেই আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। আমি আর আমার মধ্যে নেই।

আগুপিছু করতে করতে আমি কড়া নেড়ে বসেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন।

"এই যে! আপনারা! আপনারাই! আপনাদেরই অপেক্ষা করছি"—অমায়িকভাবে করমর্দনে তিনি এগিয়ে এলেন: "আমিই তুষানল বাবু। আমার সেই মাস্তুত ভাইটি—আমাদের সহকারী সম্পাদক—তিনি একটু বেরিয়েছেন। এই এসে পড়লেন বলে। আপনারা আসুন।"

এই বলে আমাদের হস্তগত করে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তুষানলবাবুকেও কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা বলেই সন্দেহ হলো। কোনো সাহিত্যিকের আসরে বা সাহিত্য-বাসরেই দেখে থাকব হয়তো। আজকাল সব অলিগলিতেই তো লেখকের বৈঠক বেঁধে রয়েছে। সাহিত্যের আখড়ার তো অভাব নেই। কাগজের ওপর কুস্তি করছে না কে?

দোতালায় সেই কাঠের রেলিং ঘেরা বারান্দার কোণ ঘেঁষে একটা তেপায়া টেবিল ঘিরে আমরা তিনজন বসলুম। সেই কাঠের রেলিংটা তেমনি অক্ষয় দেহে রয়েছে; এখনো ছিন্নভিন্ন হয় নি। একান্ত অকারণেই তখন আমাদের বুক মাঝে মাঝে ছমছম করে উঠলেও, নিতান্ত অমূলক ভয়েই এমন চমৎকার বাড়িটা আমরা হাতছাড়া করেছি, তা বুঝতে বাকী ছিল না। কেননা, এই তুষানলবাবুরাই বা এমন কি মন্দ আরামে এখানে বসবাস করছেন? তাঁরা যে সদাসর্বদা, বা কালেভদ্রেও কখনো এস্থলে কোনো বিভীষিকা দেখেছেন বা দেখে আসছেন—তাঁদের চেহারায় কই তার চিহ্নমাত্রও তো নেই।

কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসতে থাকে।

ভেবে দেখলে, ভূত জিনিসটা কি ? অতীতের আবছায়া ছাড়া আর কিছু তো নয় ? বিগতকালে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আকাশ-পটে তার পুনর্মুদ্রণ বই তো না ? পৃথিবীর যত কিছু শব্দের মতো যাবতীয় দৃশ্যও তো আবহাওয়ার ভাঁড়ার ঘরে জমা হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগতই জমছে। আমাদের কান যদি কখনো রেডিয়োর পর্যায়ে ওঠে, এক মুহূর্তের জন্যও ওঠে, তাহলে সেই মুহূর্তেই আমরা আকাশ-বার্তা শুনতে পাই, দৈববাণী যার নাম দিয়েছি। তেমনি এই নশ্বর নেত্র যদি কখনো টেলিভিসনের পর্দায় নামে, তাহলে তার আকস্মিক আভাসেই দৈবাৎ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে যায়—যাকে বলি ভূত। কিন্তু বরাবরই যে সেই একই দৃশ্য দেখব, বারংবারই এই চর্মচক্ষু টেলি-ভিসনে পরিণত হবে, তার কি মানে আছে ? হায় হায়, অন্ধতাবশে ভুলবশতঃ এমন যার পর নাই বাড়িটা বেহাত হতে দেয়া বড্ড বোকামী হয়ে গেছে, মনের মধ্যে হা-হুতাশ হতে থাকে !

একটু পরেই লালায়িত রায়, অকৃত্রিম সম্পাদকের সহযোগী সেই আদিম লেখক, একরাশ খাবারের মোট নিয়ে ফিরে এলেন। খাবারের সম্পাদন করতেই তিনি বেরিয়েছিলেন, বোঝা গেল। কিন্তু তাঁকে দেখে, আর তাঁর হাতে খাবারের "ও! তা—তা—" আমি আমতা আমতা করিঃ "আপনি লেখক ? বেশ ! বেশ !"

ঝুড়ি দেখে, কোথায় আমরা পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠব, ততক্ষণে আমাদের হয়ে এসেছে !

প্রথম দর্শন থেকেই ওঁদের দুজনকে আমাদের চিনি চিনি ঠেকছিল, কিন্তু কেন যে এত মিঠে মনে হচ্ছিল, এখন এঁদের উভয়কে একসঙ্গে দেখে, একেবারে পাশাপাশি দেখে, যুগপৎ দেখবার পরে, বুঝতে আর বাকী থাকে না।

এঁরা উভয় যে সেই দুটি ভয় ভয়াবহ সেই দুই অভিব্যক্তি একদা যাঁদের আমেরা এইখানেই, এই বারান্দার ধারেই ধাক্কাধাক্কি করে; রেলিং ভেঙে, সবেগে, নেমে যেতে দেখেছি সেই দুই অবতারই আজ

এই নবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সে বিষয়ে আর সংশয় মাত্র রইলো না।

সেদিন এদের এই মারাত্মক মাস্তুতো ভাইদের—অশরীরী দেহে দেখেছিলাম, ওঁদের কার্যকলাপও ছিল নিঃশব্দ; কিন্তু আজ আজ একটু আগেও তো ওঁদের একজন করমর্দনের অজুহাতে নিজের অস্থিমজ্জার অস্তিত্ব আমাদের জানিয়ে রেখেছেন এবং এতক্ষণ ধরে কত খোস-গল্পই তো একত্র বাস করা গেল! এসব কি একান্তই মহাপ্রভুদের ছলনা তাহলে? সূক্ষ্ম লীলা?

এঁরা কি তাহলে—তাহলে তাই ছাড়া আর কিছুই নয়? ভাবতে না ভাবতেই আমাদের হৃৎকম্প শুরু হয়।

কিন্তু একটু একটু করে আমাদের ভয় ভাঙে। দুজনের, দুই মাস্তুতো ভায়ের গলায় গলায় ভাব দেখেই সন্দেহ দূর হয়। ওঁদের চালচলন অত্যন্তই স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের যেমন হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ব্যত্যয়—কিছুমাত্র মারাত্মকতা নেই এবং রেলিং চূর্ণ করারও যে খারাপ কোনো মতলব ওঁরা মনে মনে ভাঁজছেন, ওঁদের আচার-ব্যবহার থেকে ঘুণাক্ষরেও তা বোঝবার যো নেই। তবে বোধ হয়, এখনো ওঁরা সম্পূর্ণরূপে ভূতান্তরিত হতে পারেন নি। আগের নশ্বর দেহেই কষ্টে সৃষ্টে রয়ে গেছেন তাহলে।

আর, তাছাড়া ভেবে দেখতে গেলে (ভেবে আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে) একজন ভূতের পক্ষে (না হয় দুজনাই হোলো), পক্ষের পর পক্ষ একখানি পত্রিকা বার করা এবং তার সমস্ত কপি লেখা, তার ওপরে প্রুফ দেখা, তারপর সেই-সব প্রেস থেকে ছাপানো (ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে।), তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্টলে স্টলে যত না কপি জমা দিয়ে আসা, এবং সব শেষে শহরের সব হকারদের কাছ থেকে মারামারি করে তার দাম আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়! একজন ভূতের পক্ষে এত ভূতের খাটনী খাটা কি সম্ভব? দুজনের পক্ষেও কঠিন। বেশ কঠিন। সত্যিকারের ভূত হলে এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে কবে চম্পট দিত।

কিন্তু তবুও সেই অতীতের কথা মনে হলে একটু যেন কেমন—একটু আশ্চর্যই লাগে কেমন! ভূত যদি না হয়, তাহলে সেদিন তবে কি আময়া ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম?

নিছক ভবিষ্যৎ-ই? ভূত নয় তাহলে?

খাবার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা দুজনেই পাশের ঘরে ঢুকছিলেন জলযোগের গোছগাছ করতেই বোধ হয়।

আমি আর বিনি মুখোমুখি তাকিয়ে থাকি, এক কথাই দুজনে ভাবি। কী যে ভাবি, তা আমরাই জানিনে।

একটু পরেই একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে: "এই, এই! তুই খাচ্ছিস যে বড়?"

"বাঃ, আমি কষ্ট করে আনলাম, আমি খাব না?"

"তা বলে এখন খাবি? এখনই খাবি? অতিথিরা বসে নেই আগে তাদের দেওয়া হোক।"

"ভারী আমার অতিথি! বস্তিবাটির আস্তি খুড়ো আমার। যতই খাওয়াও চাঁদ, ভবী ভুলবার নয়! অনেক তো খাইয়েছ, অনেককেই তো খাইয়েছ। বিনি পয়সাও লেখা পেয়েছ একটাও? সে বিষয়ে হুঁশিয়ার, সে পাত্রই নয় ওরা!"

শুনতে পাবে, চুপ!"

"শুনলে তো বয়েই গেল। আমি থাকতে আবছায়া'য় আর কারুকে লিখতে দিচ্ছি না। টাকা দিয়েও নয়; টাকা নিয়েও নয়। কেবল আমি লিখব আর তুমি—তুমি সম্পাদক। তুমিও লিখতে পারো। আর কেউ না।"

"আবদার আর কি! জানিস, আমার কাগজ? তোকে লিখতে দিয়েছি তাই বর্তে গেছিস। তোর লেখা কেউ ছাপে নাকি?

"আমার লেখার তুমি কি বুঝবে? জানতো তোমার দাদা। লেখার জন্য রোজ ধর্ণা দিত আমার বাড়িতে। ক-জোড়া জুতোই খইয়ে ফেলেছিল! হুঁ।"

"দাদা তুলো না বলছি। ভাল হবে না কিন্তু!"

"তোমার চেয়ে ভালো লিখি কিনা, সেই জন্যেই তোমার এত রাগ। তা বুঝেছি। কিন্তু তার জন্যে আর কি করবে? কে আর তোমার মুখ চেয়ে খারাপ লিখতে যাচ্ছে? কালকের ছেলেও তোমার চেয়ে ভাল লিখে, তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তোমার চেয়ে নামজাদা হয়ে যাচ্ছে। তা বাপু, তুষানল, নিজের অনলে এমন তিলে তিলে আর কত দগ্ধ হবে? তার চেয়ে গলায় দড়ি দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক্!"

"ছাখ, ভলো হচ্ছে না কিন্তু! এই সা এক থাপ্পড় কসাবো টের পাবি তখন! সব লম্ফঝম্প বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি। তোর লেখা ছাপানোও বেরিয়ে যাবে। আর তোর লেখা ছাপব না যাঃ।"

তোমার লেখাই বা কে ছাপছে? নিজের বই তো নিজের টাকায় ছাপা, আবার কথা কইতে আসো! কখনো তার বিক্রি হয়? পরের হিংসেয় জ্বলে মরছ কেবল! সম্পাদক বলে কিছু বলছি না নইলে—"

তর্জনের তোড়জোড় বেড়েই চলে।

বিনি ভীতি বিহ্বল নেত্রে তাকায়।

হঠাৎ ধাঁ করে একটা রসগোল্লা কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে আসে; উল্কার মত ছুটে আসে, কিন্তু একটুর জন্যে ফসকে যায়। আমার গালে এসে লাগে - ওদের গোলমাল শুনে আমি হাঁ করে ছিলাম, কিন্তু কোনো ফল হোল না। মুখের মধ্যে না ঢুকে, রসগোল্লাটা গালের গায়ে লেগে আমাকে বাঁয়ে রেখে নিজের আবেগে ছিটকে বেরিয়ে যায়।

গতিক ভালো নয়, অন্ততঃ রসগোল্লাদের গতিবিধি খুব সুবিধের নয়।

কিন্তু তাছাড়াও—আরেকটা খটকা লাগে। চট করে আমার মনে হয়, অতীতকালের সেই ভবিষ্যৎ, সেই সুদূরপরাহত সম্ভাবনা, অন্ততঃ বর্তমানে এখনই, নিতান্ত আসন্ন হয়ে আসছে না তো? ঘোরালো হয়ে আরো জোরালো হয়ে এবং ক্ষীণকায় রেলিং-এর ওপর যদ্দূর সম্ভব ভারালো হয়ে—য়্যাঁ।

এখন পর্যন্তও যারা ভূত হতে পারে নি, কিন্তু একদা যাদের ভূত ভবিষ্যৎ যাই হোক, আমরা দর্শন করেছিলাম— অকৃত্রিম আসল ভূতে পরিণত হতে তাদের কি আর দেরি নেই ?

কাঠের রেলিংটা অটুট রয়েছে, এখনো রয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ আর এখন থাকবে ? ভাবতেই আমরা শিউরে উঠি।

আইনস্টাইন নাকি বলেছিলেন, যা অতীত, তাই ভবিষ্যৎ এবং তারাই আবার বর্তমান, এককথায় ভূত-ভবিষ্যৎ সব একাকার। মোটের ওপর ওই গোছের কী একটা কথা বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে আমাদের কাছে তিনি গছাতে চেয়েছিলেন—বলা বাহুল্য, আমার বোধগম্য হয় নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের সামনে—আগত প্রায় ওই দুই উদাহরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিমেষের মধ্যে সেই তত্ত্ব, দুরধিগম্য সেই তথ্য, বিদ্যুৎচমকের মত আমার মাথায় লেগে যায়।

সমস্ত কাল, ইহকাল ও পরকাল, কালাতীত সব রহস্য, এই কালান্তক আসন্নতার কাছাকাছি আসতেই, পলকের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে চিচিং-ফাঁকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

বুঝতে পারি ইতিহাস যেমন ঘুরে ফিরে আসে, যে কারণে আসে, তেমনি, সেই কারণেই, অনন্তের অজ্ঞাত ভাণ্ডারে জমানো একই সব দৃশ্য, অভিন্ন সব কথা অনুরূপ সব ভাব, যুগে যুগে খোলস বদলে যাতায়ত করে। খবরের কাগজের কলমের মত নতুন হুজুগের রূপ নিয়ে, সেইসব একঘেয়ে পুরানো খবর পুনরাবৃত্ত হয়। ঘুরে ফিরে ফের এসে দেখা দেয় – আবার আমরা নতুন করে পড়ি।

হারোনো অতীত বাড়ানো বর্তমানে এসে, হারিয়ে গিয়ে, আবার অনাগত ভবিষ্যতে উদ্‌যাপিত হতে থাকে। সেই উদ্‌যাপনের দায় নিয়ে পুনঃ পূনঃ আমরা জীবন যাপন করি কিন্তু কার জীবন যাপন করি ? আপনাদের সংবাদপত্র আগাগোড়া যার পড়া' যার নখদর্পণে, এমন কেউ যদি কোথাও থাকে, সে-ই কেবল তা বলতে পারে।

এই-সব ভাবি, আর কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে।

আর কিছু না ত ভবিষ্যৎ আমার থাক, কেবল বর্তমানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে খুনো খুনির সাক্ষী হবার দায়িত্ব থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্যেই আমি আর বিনি, পরস্পরকে করায়ত্ত করে সেই যে সেখান থেকে ছুট মেরেছি বেহালার পথে আর পা বাড়াই নি।

কোনদিন বাড়াবও না।

—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—

আমার অচেনা বন্ধু

ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আমার কামরায় আমি একলা। মুখ বার করে বাইরের শোভা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু কী আর দেখব? পাহাড় পর্বতের ন্যায় সব স্টেশনের একই রূপ! সেই একই রেলিং, এক ঢঙের বাড়ি, এক জাতীয় স্টেশন মাস্টার, এক ধরনের যাত্রীরা, এমন কি, লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রত্যেক স্টেশনে গার্ডসাহেবও সেই এক। 'গরম চা'—'পান বিড়ি সিগারেট'—এমন কি, ঘণ্টাধ্বনি পর্যন্ত একরকম!

দৃশ্য কিংবা শ্রাব্যের কিছু নূতনত্ব ছিল না। নূতনত্বের মধ্যে আমার কামরায় একটি নতুন আমদানী দেখা গেল। গাড়ি ছাড়বার মুখে, স্যুটকেস হাতে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ লাভ করলেন।

ভদ্রলোকের গায়ে দামী কোট—অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়। স্যুটকেসটা বাদামী, কিন্তু তাহলেও তার ভেতরে যে সারবস্তু আছে তাও বেশ মালুম করা যায়।

স্যুটকেসটি বাঙ্কে রাখার পর আমি তাঁর চক্ষে পড়লাম।

"এই যে! অনে-ক দিন পরে!" তিনি বললেন। দর্শনমাত্রই আমাকে যে তিনি চিনতে পেরেছেন তার চিহ্ন তাঁর মুখে চোখে সকাল-বেলায় সূর্যকিরণের মত ছড়িয়ে পড়ল।

"এই যে! অনে-ক দিন প'রে!" আমিও পুনরুক্তি করেছি। যদিও অনেকদিন পরে যে, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করার কিছুই ছিল না।

সতর্ক হয়ে বসতে হয়। একেই আমার চোখ খারাপ, উপাদেয়

দ্রষ্টব্য ছাড়া আর কিছু এই পোড়া চোখে পড়তেই চায় না, তার ওপরে রাস্তায় ঘাটে অচিন্ত্যনীয় দেখা-সাক্ষাৎ লেগেই রয়েছে।…চোখের দোষ নয়, লোকেরও কোন দোষ নেই না—ও আমার কপালের দোষ।

তবু একটু সতর্ক থাকা দরকার, কি জানি, যদি আলাপের ত্রুটিতে বিলাপের কোনো কারণ ঘটে যায়! তবে আমি চালাক্ ছেলে! এরকম ক্ষেত্রে অপর পক্ষ 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে আমিও 'আজ্ঞে' বলতে কসুর করি না, সে 'তুমি' বলে শুরু করলে আমিও তখন 'তুমি' চালাই, আর সে যদি 'তুই তোকারি' আরম্ভ করে—তখন আমাকেও বাধ্য হয়ে—কি করব?—আমিও ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নই তো?

নিশ্চয় আগে চিনতাম—হয়তো খুব প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতাই ছিল এককালে--কিন্তু এখন আর চেনা যাচ্ছে না—এমন লোকের সঙ্গে নতুন আলাপ জমানো যে কী মুশকিল! অনেক এমন দুর্ঘটনাও ঘটে—সর্বদাই যে আপনি তুমির সমস্যা আপনার থেকে ফয়সালা হবার সুযোগ পায় তা হয় না—অনেক সময় এমন হলো যে আক্রমণকারী কোনো মতে ধরাছোয়াই দিল না—কোনো প্রকার সম্বোধনের ধার দিয়েই ঘেঁষল না একদম। তখন অগত্যা ভাববাচ্যেই সারতে হয় আগাগোড়া : যথা, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কোথায় থাকা হয় আজকাল? বাড়ির সবাই বেশ ভালো তো?'…ইত্যাকারে।

আমি নড়ে চড়ে বসি, সম্বোধনের গতি দেখে আলাপের বিধি করতে হবে—এবং যদি সম্ভব হয়, আলাপ-সালাপের ভেতর দিয়ে তেমন যদি কোনো সূত্রপাত দেখি, লোকটাকে হয়ত পুনরাবিষ্কারও করতে পারি।

আপাদমস্তক উদগ্রীব হয়ে রইলাম—আমার নব আলাপিতের নৈঋতকোণ থেকে অজ্ঞাতপূর্ব পরিচয়ের নতুন কোনো ঝড় আসে কিনা তার জন্য—চোখ কান খাড়া করে।

নিদারুণ ভাবে কোলাকুলি করে ভদ্রলোক আমার সামনে বসলেন।

—"আশ্চর্য এভাবে যে দেখা হবে তা কে ভাবতে পেরেছিল?" বললেন তিনি।

সত্যি! একথা কে ভেবেছিল, আমি ভাবলাম। কেউ ভাবে নি। আমিও ভাবতে পারি না! "আশ্চর্যই তো!" বাধ্য হলাম বলতে আমিও।

"একটুও বদলাও নি তুমি।" সে বলল।

"তুমিও তো প্রায় সেই রকমটিই রয়েছো।" আমি বললাম, অন্তরের সঙ্গে সায় দিয়েই বললাম। সত্যি বলতে, সম্বোধনের বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত হবার সাথে সাথে তার সম্বন্ধে যৎকুঞ্চিৎ অন্তরঙ্গতাও বোধ করছিলাম যেন। ঘাড় থেকে, বলতে কি, যেন একটা ভার নেমে গেছল! যদিও নতুন একটা গন্ধমাদন এসে চাপল, তাহলেও, তুমিত্বের ভূমিতে ওকে লাভ করে সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বেও যেন আমি ফিরে পেলাম—

"তবে তুমি যেন একটু মোটা হয়েছো আগের চেয়ে—" সমালোচ-কের দৃষ্টিতে ও আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে। "মুটিয়ে গেছ বেশ।"

"হ্যাঁ, একটু।···কিন্তু তোমাকেও তো বড়ো রোগা দেখছিনে হে!" ওর অভিযোগ মেনে নিলেও, ওর স্থূলত্বের মধ্যেই আমার অপরাধের অনেকখানি সাফাই হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয় যেন!

"মোটা হওয়া কিছু দোষের নয়—আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের আয়তনও বাড়ে। কিন্তু ছেলেবেলায় কী রোগাই না ছিলে তুমি, ইস! হাওয়ায় উড়তে যেন! অবশ্যি, লঘুত্বে আমিও তখন কিছু কম যেতাম না!···থাক গে!"···অতীতের আর বর্তমানের—আমাদের ব্যক্তিগত অপরাধ ও মার্জনার চোখে দেখতে চায়।

আমিও আর শরীরের দিকে নজর দিই না! "যেতে দাও।" বলে দু'জনের সমবেত ওজনকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিই।

এই সব বাক্যালাপের ফাঁকে-ফোকরে লোকটাকে আন্দাজ করার চেষ্টা পাই, কিন্তু মুশকিল এই, মানুষের মুখই যে আমি শুধু ভুলে যাই

তাই না, তাদের নামও আমার স্মরণে আসে না—এমন কি, কোথায় যে কোন মূর্তিমানকে কোন অশুভক্ষণে প্রথম দেখেছিলাম তাও কিছুতে আমার মনে পড়তে চায় না। তাছাড়া পোশাক পরিচ্ছদ থেকে কারো যে থই পাবো তারই বা যো কী। কে আর কার সাজসজ্জা কোন. কালে খুঁটিয়ে দেখেছে ? কিন্তু এই সব খুঁটিনাটি বাদ দিলে প্রত্যেককে আমি বেশ ভালো রকমই চিনতে পারি। এবং এজন্য আমার যথেষ্ট গর্ব আছে।

যাক। নাম আর চেহারা মনে না এলেও কিছু আসে যায় না—কেবল একটু হুঁশিয়ার থাকলেই হয়। কথাবার্তার খেই ধরে থাকতে পারলেই খেয়া পার হওয়া যায়। এক্ষেত্রেও আমাকে একটু তৎপর হয়ে থাকতে হবে। এবং তা পারলেই, ক্ষণিকের এই আলাপ-পারাবার শেষ পর্যন্ত ঠিক উৎরে যাব, সন্দেহ নেই।

"উঃ, কদ্দিন পরে এই দেখা ?" ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"বহুৎ দিন।" ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আমি জবাব দিলাম। তার বিরহে আমিও যে নিতান্ত অকাতর ছিলাম না, বিষণ্ণতার আমেজ এনে ওকে সমঝাতে চাইলাম।

"কিন্তু দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে গেছে।"

"একেবারে বিদ্যুতের মতো।" আমি সায় দিই।

"আশ্চর্য।" ও বলতে আরম্ভ করল—"জীবনের কথা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। বছরের পর বছর কি করে কেটে যায়—দেখতে না দেখতেই কোথায় যে চলে যায়—" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"ভালো করে দেখতে না দেখতেই কেটে পড়ে।" আমি ওর দীর্ঘনিশ্বাসে যোগ দিই : "বাস্তবিক, ভাবলে তাক লাগে।"

"কেটে যাচ্ছে আর পুরোনো বন্ধুদের কোথায় যে আমরা হারাচ্ছি! কোথায় যে ওরা গেল, অনেক সময় আমি ভাবি।"

আমিও।" আমি বলি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ভেবে কোন কূল কিনারা পাই না। বস্তা বস্তা লোক সব গেল কোথায় ?

কোনঅবস্থার মধ্যে গেল ? মারা গেল, না, খোয়া গেল ?না, নিরুদ্দেশেই বেরিয়ে গেল বিজ্ঞাপন না দিয়ে ? নাকি, সবাই পণ্ডিচেরিই চলে গেল বিনা নোটিসে ? পকেটমার হয়ে জেল খানাতেই জমলো কিনা কে জানে !

"তুমি কি সেই পুরোনো আড্ডায় যাও আর ? সে জিজ্ঞেস করে।

"কক্ষনো না।" আমি সুদৃঢ়তার সহিত বলি। স্পষ্টই একথা জানিয়ে দি। এ বিষয়ে কোনো সংশয় রাখা ঠিক না—যতক্ষণ না, কোথাকার সেই পুরোনো অড্ডা, তার ঠিক ঠিকানা পাচ্ছি, তাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে পারছি ততক্ষণ কোনো আলাপ আলোচনার মধ্যেই তার উত্থাপন হতে দেয়া উচিত নয়।

"তাই।" সে বলে চলে : "আমিও জানতাম যে তুমি আর সেখানে যেতে চাইবে না।

"আজকাল আর যাইনে।" গদগদ স্বরে আমি জানাই।

"বুঝতে পারছি। বিশেষতঃ সেই বিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটবার পর কি করেই বা যাবে ? যাক, ওই প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপনের জন্যে আমি দুঃখিত। তুমি আমায় মাপ করো।" অনুতপ্ত কণ্ঠে ও আমার মার্জনা ভিক্ষা করে।

প্রাক্তন আড্ডা ঘটিত দুর্ঘটনার পরিমাপ করতে না পারলেও ওকে আমি মাপ করে দিই। পুরোনো স্মৃতির পূর্বক্ষত মূলে পুনরাঘাত লাভ করে মুখ চুন করে থাকি। আশানুরূপ আমাকে মর্মাহত হতে হয়, কি করব ?

ক্ষণিক স্তব্ধতার পর আবার ও শুরু করে : "মাঝে মাঝে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা তোমার কথা জিগ্যেস করে। তুমি কী করছ জানতে চায়।"

"হতভাগারা।" আমি মনে মনে বলি—মুখ ফুটে বলতে সাহস পাই না।

"তাদের ধারণা তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ !"

এবার আমার রাগ হয়। বারংবার আহত হয়ে আমিও মরিয়া হয়ে উঠে পালটা আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত হই। অন্যান্য ক্ষেত্রে, আগের আগের বারে যেসব ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছি তারই একটা নিক্ষেপ করি এবার।

"ভালো কথা!" আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বলি: "আমাদের কেলোর কি খবর?

এ অস্ত্র যে অব্যর্থ, আমার জানা। প্রত্যেক দলেই একটি করে কেলো থাকে। থাকবেই। কেলো, কালু, কেলে—নামকরণের প্রকার ভেদে—ঘোরতর কৃষ্ণকায়—উক্ত বিশেষ্য পদ বাক্য কেউ না কেউ—না থেকে যায় না।

"ওঃ! কেলো! সে এখন মলঙ্গা লেনের কোন এক আপিসে চাকরি করে। ইয়া মোটা হয়েছে—পাক্কা আড়াই মণ—তার ওপরে আবার রঙের যা খোলতাই হয়েছে—যদি দেখতে! তাকে এখন চেনাই দায়! তুমি অন্ততঃ চিনতে পারবে না।"

নিশ্চয়ই না, সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। এখনই এবং এখানেই—না দেখেই। অতঃপর আবার একটা শরসন্ধান করলাম—"আর আমাদের পদা! পদা কী করছে?"

"পদা? কোন্ পদা? তুমি বুলুর ভাই পদার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, বুলুর ভাইই তো! বলুর ভাই পদার কথাই বলছি। প্রায়ই তার কথা আমার মনে পড়ে।"

কোনোরকমে সামলে নিই! প্রত্যেক বনেদী বন্ধুগোষ্ঠীতেই পদা বলে কেউ থাকে—পদস্থ ব্যক্তি কেউ না কেউ থাকবেই। আমাদের পুরোনো দলটাতেও তার ব্যতিক্রম থাকা উচিত নয়। পদাকে না ধরতে পারলে আমি নিজেই ধরা পড়ে বিপদে পড়তাম যে!

"পদার কোন খবর নেই। তবে তার দাদা, মানে বুলু, পাহারোলা হয়েছে। দারোগা হবার চেষ্টা করেছিল খুব; কিন্তু পারল না।"

"দুঃখের বিষয়!" আমি সহানুভূতি প্রকাশ করি।" "খুবই

দুঃখের বিষয়। তবে যা দিনকাল পড়েছে—রাস্তায় একটা ফেরিওলাও সহজে হওয়া যায় না।”

“বিশের খবরটা শুনেছ বোধহয়! তার সেই একমাত্র—তাঁকে চিনতে তো? বড্ড শোক পেয়েছে বেচারা। যদিও খুব বৃদ্ধ বয়সেই গিয়েছেন, দুঃখের কিছু নেই, তবুও সে ভারী কাতর হয়ে পড়েছে।”

বিশের শোকে আমিও বিশেষ ব্যথা পাই, অক্ষুণ্ণ থাকতে পারি না। মৃত্যু মাত্রই শোকাবহ, বিশেই কি আর বিয়াল্লিশেই কি, আর বাহাত্তরে হলেই বা কম কিসে! কিন্তু লোকটা কে? মানে, বিশের সম্পর্কে কে? বাবা নয় নিশ্চয়—বাবা তো একমাত্রই হয়—মায়ের মাত্রাও ঠিক তাই।—তা হলে? ছোট ভাইরা কিন্তু বিশের চেয়েও বেশি বুড়িয়ে মরতে পারে না। এ তা হলে কে রে বাবা?

যিনিই হোন, আন্দাজের ঢিল ছুড়ি। “হ্যাঁ, চিনতাম বই কি! এখনো যেন ছবির মতন আমার চোখের ওপর ভাসছেন……”

“আর বিশের পিসেই তো…” বলতে গিয়ে ভাবাবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়।

“বিশের পিসেই তো!” বলতেই আমি কথাটার খেই ধরিঃ “এমন অমায়িক লোক আমি দেখি নি। তা, বিশুর পিসে গেলেন কিসে? বিসূচিকায় নাকি? আহা, বড্ড ভাব ছিল আমার তাঁর সঙ্গে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত তো বেশ টনকো ছিলেন। এমনটা দেখা যায় না! আহা—তাঁর সেই দিব্যকান্তি এখনো আমার চোখে ভাসছে। আর ওঁর সেই হুঁকো টানা। আহা, তামাক খেতে কী ভালোই না বাসতেন।”

“হুঁকো? বিশের পিসিমা হুঁকো টানতেন? বলছ কি তুমি?” নিজের কানকে ও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

“বিশের কোন্ পিসী? আমি ওর কোন পিসীকে চিনিনে তো। আমি ওর পিসের কথাই বলছি।”

“ওর পিসেকে কেউ কখনো চোখে দেখে নি। বিয়ের রাত্রেই তো

তিনি পালিয়ে যান।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন : দুঃখের কারণ তো ঐখানেই। বুড়োবয়স পর্যন্ত বিশের পিসী একদিনের তরেও স্বামীর ঘর করার সুখ পান নি।"

"কোন্ বিশে বল তো ?" ডুববার মুখে আমি শেষ তৃণটি পাকড়াই—"আমার কেমন গোলমাল হচ্ছে।"

"ও, বুঝেছি! তুমি আমাদের বিশুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছো। হ্যাঁ, তাদের বাড়িতে একজন হুঁকোখোর আছেন বটে! তিনি ওর পিসে বুঝি? তা তো জানতুম না—তাহলে ঠিকই হয়েছে। না, তিনি মারা যান নি—এখনো সমানে হুঁকো টেনে চলেছেন।"

আঃ, শুনে বড়ো সুখী হলাম। আমি বলি। বিশে এবং বিশুর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে জেনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

"এর পরের ইষ্টিশনই রানাঘাট—তাই না?" আমার বন্ধু হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"রানাঘাট অব্দি টিকিট কেটেছি—কিন্তু এখন ভাবছি কলকাতাই চলে যাই! এখানে গাড়ি থামলেই চট করে নেমে টিকিটটা কিনা আনা যাবে—ঐ সামনেই তো টিকিট ঘর—কি বলো?"

আমি ঘাড় নাড়তেই তৎক্ষণাৎ উঠে পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করলেন—তাঁর নিজের পকেট। "যাঃ, সুটকেসের চাবিটা আবার কোথায় ফেল্লুম? কী সর্বনাশ, ওর মধ্যেই আমার সব টাকাকড়ি যে! দেখি, তোমার চাবিটা দেখি, আমার কলে লাগে কিনা দেখা যাক।"

আমার সুটকেসের চাবিটা ওকে দিলাম—কিন্তু সে লাগতে রাজী হয় না—কোনোমতেই না। ইতিমধ্যে রানাঘাট কিন্তু এসে হাজির হয়।

"খুচরো টাকা কয়েকটা দাও তো ভায়া, টিকিটটা কিনে আনি।" ও বলে : "শেয়লদায় নেমে, ভেঙ্গে হোক, যা করে হোক, যা করে হোক, এটা তো খুলতে হবে। তখন তোমায় দিয়ে দেব—কেমন?"

বন্ধু হয়ে বন্ধুর এটুকু উপকার না করা ভাল দেখায় না—কটা টাকাই বা আর? আমি মনিব্যাগটার মুখ খুলি—একটু ফাঁক করি মাত্র—কিন্তু ওঁর আর তর সয় না উত্তেজনার মুখে গোটা মনিব্যাগটাই হস্তগত করে তিনি নেমে পড়েন।

যাক। এক্ষুণি তো ফিরে আসছে ফের! নাকের বদলে নরুন—আমার ছোট মনিব্যাগের বদলি ওর এই বৃহৎ সুটকেসটাই যখন জমা রেখে গেছে তখন আর ভাবনা কিসের? নাকের বদলে মৈনাকই বলতে হয় বরং।

আমি মুখ বাড়িয়ে দেখি, ও টিকিট ঘরের দিকে চলেছে, কিন্তু যের ম ঢিমে-তেতালায় চলেছে, আমার ভয় হয়, ট্রেন ফেল করে না বসে! তবে এখানে গাড়ি একটু বেশীক্ষণ দাঁড়ায়, এই যা!

গাড়ি প্রায় ছাড় ছাড়, কিন্তু বন্ধুর আমার দেখা নেই। একি, ওর মালপত্তর আমার হেফাজতে ফেলে ও আবার গেল কোথায়? এমন সময়ে আরেক ব্যক্তি কামরার দরজা খুলে ঢুকলেন।

"এই যে! এই যে!" সেই ব্যক্তি বললেন। তারও বদনমণ্ডলে পূর্ব পরিচয়ের চুশ্চিহ্ন—সেই অপূর্ব হাসি! অবিকল আগেকার অভিব্যক্তি!

আমি তটস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু না, এ হাসি আমাকে দেখে নয়—আমার বন্ধুর সুটকেসটি দর্শন করেই! ওটিকে হাতেনাতে পাকড়ে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন:

"এই যে! এখানে ফেলে রেখে গেছে হতভাগা। বন্ধুদের কাউকে যদি বিন্দুমাত্র বোঝা যায়! বুঝব কি, চিনতেই পারা যায় না। দুঃখের কথা কি শুনবেন—আমি আপ ট্রেনে যাব মশাই, কিন্তু এই ডাউন ট্রেনে আমায় যেতে হচ্ছে। শিলিগুড়ির বদলে কলকাতায় যাবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না! কিন্তু এমনি গ্রহের ফের, পোড়াদা ইষ্টিশনে দার্জিলিং মেলের জন্যে অপেক্ষা করছি এমন সময়ে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাৎ! ছেলেবেলার কোনো বন্ধু নিশ্চয়, চেনাই যায় না

একদম। সে আমায় কিন্তু বেশ চিনেছে, তবে আমি যে তাকে মোটেই চিনতে পারি নি তা আমি তাকে বুঝতে দিই নি! গাড়ি ছাড়বার মুখে বন্ধুটি ভুল করে তার নিজের মনে করে আমার ব্যাগটি নিয়ে উঠে পড়লেন! কি করি, আমিও এই গাড়িতে উঠে তখন থেকে প্রত্যেক স্টেশনে নেমে নেমে কামরায় কামরায় বন্ধুটিকে গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি—কিন্তু গাড়িও কি ছাই এধারকার ইষ্টিশনগুলোয় এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায়!" বকতে বকতে ব্যাগ হাতে ব্যগ্র হয়ে তিনি নেমে পড়লেন—গাড়ি ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে।

—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—

কোন খেলাই সহজ নয়

শরীর সুস্থ রাখতে ব্যায়ামের দরকার। আর ব্যায়ামটা যদি খেলা-ধুলার ভেতর দিয়ে অগোচরে হয়ে যায় সেটা ভালো আরো। কিন্তু সব খেলাধুলা আমার পোষায় না। লুডো, দাবাবোড়ে, স্নেক্ এ্যাণ্ড ল্যাডার এসব খেলাকেই সহজেই আমি পোষ মানাতে পারি বটে, কিন্তু এগুলোতে তেমন নাকি ব্যায়াম নেই। এধারে ফুটবল, ক্রিকেট—এসব খেলার সঙ্গে গায়ের জোরে আমি পেরে উঠিনে। 'রাগবি?' ও বাব্বা! রাগবি খেলায় লাগবার মতো রাগবার অতো ক্ষমতা নেই আমার। রেগেমেগে কিছু করা আমার অসাধ্য। রাগ-রাগিণী-রাগ-বি—এসব আমার সয় না।

অবশেষে ব্যাড্‌মিন্টনকেই অনেক বেছে ধরা গেল। এককালে এই খেলাটারই যা একটু আমার অভ্যেস ছিল। এই খেলাটাই ধরা যাক্? কিন্তু আমার সঙ্গে এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে এমন আরেকজনকেও ধরা চাইতো? মুশকিল হয়েছে, ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে এমন একটা লোকও এ পাড়ায় নেই। অনেক করে' ধরাধরি করে' অশোককে পাওয়া গেল অবশেষে।

অশোক কিন্তু গাঁই গুঁই করে, কিছুতেই খেলতে রাজী হয় না। বলে "আমি ভাই ও খেলার কিছুই জানিনে।"

"শিখে ফেলতে পারবে। শিখতে কতক্ষণ?" আমি ওকে উৎসাহ দিই; সত্যি বলতে আমার নিজেরও তো সবেমাত্র শুরু। ক' মাসই বা খেলেছি। অবিশ্যি আগের একটু অভ্যাস ছিল কিন্তু সেও কতকাল

আগে। "দু'একদিন অভ্যেস করলে তুমিও আমার মতন ভাল—কিংবা আমরা মতই খারাপ খেলতে পারবে। আশ্চর্য নয়।"

অশোক তবু ঘাড় নাড়ে। খেলাধুলায় এতদূর নারাজ হতে পারে এমন ছেলে এর আগে আমার নজরে পড়ে নি।

"খেলাধুলা আমি চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়েছি ভাই" বল্ল অশোক: "খারাপ খেলি তার জন্যে না। খারাপও খেলি না, আর হারিও না বড় একটা, তবে বড্ড ভুল খেলে থাকি। এইজন্যই মনকষ্ট পাই। অনর্থক মনকে আর কষ্ট দিতে ভাল লাগে না!" এই বলে সে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ল।

"ভুল খ্যালো, তার মানে? আমি জিজ্ঞেস না ক'রে পারি না।

"ছোটবেলা থেকেই ভুল খেলি—যে খেলা খেলতে যাই। তার জন্য ওস্তাদদের কাছ থেকে কী কম বকুনিটাই খেয়েছি। প্রথম যখন ক্রিকেট খেলতে ধরলাম ইস্কুলে পড়ি তখন। আমাদের গেম্ মাষ্টার বল্লেন, 'অশোক, তুমি ব্যাট ঠিক ধরতে পারছ না। আমি তো ভারী ধাঁধায় পড়ে গেলাম। ধরেছি তো, আবার কি ক'রে ব্যাট ধরতে হয়?' আমার নিজের ধারণামত ব্যাটকে আমি দস্তুরমতোই ধরেছিলাম। কেবল ধরা কেন, পাক্‌ড়ে ছিলাম বল্লেই ঠিক হয়। কিন্তু ওই ধরনের গেম মাস্টারের মনঃপুত নয়। তিনি বল্লেন, ধরতে পেরেছি। কেন তোমার এই ধারা গলদ হচ্ছে ধরা গেছে। তুমি কি কখনও ডাণ্ডাগুলি খেলতে? খেলতে নাকি? এক-আধটু আমি স্বীকার করলাম, কখনো সখনো—এই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেই। 'বোঝা গেল এইবার।' বল্লেন গেম মাস্টার, 'সেই ডাণ্ডাগুলির ডাণ্ডার মতোই তুমি ব্যাট পাক্‌ড়েছ বটে। ওভাবে ধরা নিয়ম নয়। ক্রিকেট্ খেলার একটা ষ্টাইল্ আছে। সে স্টাইল্ই হলো আলাদা'—এই বল্লেন গেম্ মাস্টার। বলতে বলতে অশোক থামল।

"গেম্ মাস্টার ঠিক কথাই বলেছিলেন"—আমি বল্লাম।

"সে কথার আমি প্রতিবাদ করি না। গেম্ মাস্টার আরো বল্লেন

যে ক্রিকেটে আমি কোনদিন সাইন করতে পারবো না—যদি না ঐভাবে ব্যাট ধরার বদভ্যাস আমি ছাড়তে পারি। অবশ্যি, তাঁর ঐ বলার পরেই পরপর আমি চারটি বাউণ্ডারি করেছিলাম তাঁর দেওয়া বলের বিরুদ্ধেই। ঐভাবে ব্যাট ধরেই যদিও। কিন্তু তবু তিনি খুশী হলেন না তাঁর মত বদলানোর বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পেলেন না।"

অশোক মুখভার করে তার শোকাবহ জীবনকাহিনী ব্যক্ত করে চল্‌ল।

ঐ ক্রিকেট্-কাণ্ডের কয়েকমাস পরে (অশোক বল্ল আমায়) সে একবার টেনিস খেলা ধরেছিল। এমন কি, একটা ইণ্টার ইস্কুল টেনিস্ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় যে ছেলেটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় তার বাবা বিখ্যাত ফরাসী প্লেয়ার কোশের সঙ্গে একহাত খেলেছিলেন—কোশে যখন কলকাতায় এসেছিল সেই সময়ে। কাজেই, তাকে যে কোন ছেলে হারাতে পারবে এ আশা কেউ করে নি, সে নিজেও না, অশোকও নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, কি করে' বলা যায় না, অশোক তাকে সব কটা সেটেই হারিয়ে দিল! সেই ছেলেটি, খেলা শেষ হয়ে গেলে, অশোককে ডেকে বলেছিলো, "খোকা তোমার বয়সের তুলনায় তুমি ভালোই খ্যালো একথা বলতে আমার বাধা নেই: কিন্তু আমার ভয় হয়, কোনদিনই প্রথম শ্রেণীর টেনিস প্লেয়ার হতে পারবে না! কোশের মত হওয়া দূরে থাক্, আমার বাবার মতও নয়। তুমি যে ভাবে র‍্যাকেট ধরেছিলে অমন ক'রে র‍্যাকেট ধরতে এর আগে আর কাউকে আমি দেখি নি। তুমি কি কখনো ক্রিকেট্ খেলতে?"

"কিছুদিন আগে খেলেছিলাম।" বলতে হলো অশোককে: "এক আধবার। সে নামমাত্র। কবে ছেড়ে দিয়েছি!"

শোনবামাত্রই ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বল্ল, "ধরেছি ঠিক। কেন যে তুমি র‍্যাকেটের প্রতি ক্রিকেট্ ব্যাটের মত ব্যবহার করেছিলে এখন তা টের পাওয়া গেল।" এই বলে সেই ছেলেটি একটু মুচকি হেসে, অশোকের সমস্ত জয়গৌরব ম্লান করে দিয়ে চলে গেল।

এর ফলে অশোক তার হৃদয়ের দুর্বল স্থানে দারুণ আঘাত পেয়েছিল, বলাই বহুল্য। র‍্যাকেটের প্রতি ব্যাটের মত ব্যবহার করা—দুর্ব্যবহার করা ছাড়া আর কি? ভগ্নহৃদয়ে সেই দণ্ডেই সে টেনিস খেলা জেড়ে দিল চিরদিনের মতন।

এবং একটু আশান্বিত চিত্তে ফিরে গেল ক্রিকেটে তারপর। আর যাই হোক, র‍্যাকেটের দৌলতে, ব্যাট ধরবার কায়দাটা তো সে শিখতে পেরেছে—সেটাও বড় কম লাভ নয়। এবং ক্রিকেট খেলাতেও কি কোশের তুল্য বিখ্যাত কেউ নেই—যাঁরা কষে ব্যাট হাঁকড়ে পুনঃপুনঃ সেঞ্চুরি করে অমর হয়েছেন? তাঁদের একজনের সমকক্ষ হতে পারলেও তো হয়! তা কি কিছু কম নাকি? এবং তা কি সে হতে পারবে না কোনদিন? টেনিসে অনুযোগ লাভ ক'রে ফিরে এসে সে ক্রিকেটে যোগদান করল।

এবং এবারেও একাদিক্রমে কয়েকটা বাউণ্ডারি আর অসংখ্য রান তুলে ফেলবার পরে গেম্ মাস্টার এগিয়ে এলেন। এসে বল্লেন, "অনর্থক তুমি খেলতে নেমেছো। ক্রিকেট তোমার দ্বারা হবার নয়। তোমার হাত দেখছি বিগড়েছে আরও। ঠিক টেনিস্ র‍্যাকেটের মতই তুমি ব্যাট ধরছো এখন। এবং এটা আগের চেয়েও খারাপ।"

অশোক দমে গেল খুব। যতই না সে জিতুক, শোকে ঘাড় নাড়তে থাকে। বলে, ও কিছু না, কিছু হচ্ছে না। জিতলে কি হবে, ওর খেলায় কোন স্টাইল নেই। আর স্টাইলই যদি না থাকল তাহলে আর খেলার থাকলো কি?

এতদূর পর্যন্ত উল্লেখের পর অশোক আমার মুখের দিকে তাকালো: "এ বিষয়ে তোমার কি মত? ঐ লোকদের কথাই কি ঠিক না?"

আমি উক্ত লোকদের উক্তিতে সায় দিতে বাধ্য হলাম। বল্লাম, "ঠিকই বলেছে ওরা। খেলার হারজিত বড় নয়। এমন কি, খেলাটাও কিছু না। খেলার চেয়ে খেলার কায়দাটাই হলো আসল। সেইটাই বড় কথা। কায়দা করে খেলে মোহনবাগান কতোবার তো হেরে

গেছে, গ্যাখোনি কি? কিন্তু তাতে কি তার মাহাত্ম্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয়েছে?···যাক্‌গে, তুমি কি তারপরে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিলে একেবারে?"

"জন্মের মত।" বল্ল অশোক: "ন্যাড়া আবার ক'বার বেলতলায় যায়?"

এর পরের বৃত্তান্তটাও শুনলাম অশোকের। সব শেষে, খেলাধুলা সমস্ত ছেড়ে সে একটা কুস্তির আখড়ায় ভরতি হয়েছিল। দেহচর্চার জন্য একটা কিছু করা চাইতো।

কিন্তু যেমনি সে মুগুর ভাঁজতে আরম্ভ করেছে আখড়ার ওস্তাদ হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন—"ও কি? ও কি হচ্ছে? করছ কি? মুগুরের অমন করে অপমান করছ কেন?"

অশোক ভাবলো, ঘোরাবার মুখে মুগুরটা পায়ে ঠেকেছিল বলেই বোধহয় ঘাট হয়েছে। অমনি ভয়ে ভয়ে মুগুরকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করল। মুগুরের পায়ে মাথা ঠুকতে বাধ্য হলো, কি করবে? ওস্তাদের চেহারা মুগুরের চেয়েও গুরুতর ছিল কিনা!

কিন্তু তাতেও ওস্তাদজী শান্ত হবার নন। তিনি কেবল আপশোস করেন—এ কি রকম মুগুর ভাঁজা তোমার? এরকম তো কেউ মুগুর ভাঁজে না। তুমি কি কখনো ক্রিকেট খেলতে নাকি? ব্যাটের মতো মুগুরটাকে হাঁকড়াচ্ছো ব'লে যেন বোধ হচ্ছে।"

এই কথা শুনে মুগুর ফেলে সেই যে অশোক সেখান থেকে দৌড় মেরেছে আর তাকে আখড়ার ত্রিসীমানাতেও কেউ গ্যাখে নি। এই তার খেলাধুলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,—এসব শুনে এর পরেও কি তাকে আমি ব্যাডমিন্টন খেলতে বলি? সে আমায় প্রশ্ন করে। আমি হয়ত বলতে পারি কিন্তু তার মোটেই আর সাহস হয় না। সে নিজেই উত্তর দেয়।

"খ্যালো না ক্ষতি কি!" আমি প্রত্যুত্তরে বলি: "যতো খুশী তুমি ভুল খেলতে পারো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এবং আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি যদি খেলার দোষে হেরে যাও

তাহলে আমি খুশীই হবো। হারাতে পারলে আমার ভারী আনন্দ হয়।”

আর কিছু না, কেবল আমাকে আনন্দ দানের জন্যেই নিস্বার্থপর হয়ে অশোক খেলতে নামলো। কিন্তু আনন্দ দেওয়া দূরে থাক, একটার পর একটা, ও নিজেই “গেম আপ” করে চল্ল। অল্প কিছুদিন খেলাটা ধরলেও, এর মধ্যেই বেশ আমি রপ্ত হয়েছিলাম বলে’ ধারণা হয়েছিল, ও কিন্তু প্রথম নেমেই আমার সে ধারণা টলিয়ে দিতে থাকে।

—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—

বিনিপ্রত্যয়

বিনিকে নিয়ে…কী আর বলব ? যা মুশকিল হয়েছে আমার।

বিশ্ব ব্যাকরণের মধ্যে না থাকলেও বিনি প্রত্যয় বলে একটা জিনিস আছে যার সংজ্ঞা হয় না। আমার বোন বিনির মতন মেয়ের খপ্পরে যে পড়ে, কেবল তার ভেতরেই এই বোধ গজায়। এক রকমের প্রজ্ঞা…বোধও হয়তো বলা যায় যা তার অন্তরে সঞ্চারিত হয় যার দ্বারা…

যার দ্বারা সে বেহুঁশ হতে হতে সামলে ওঠে।

এই যেমন আজ সকালেই।

একটা জরুরী ঠিকানা কি করে পাই তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, সেই দুর্ভাবনার দারুণ মুহূর্তে বিনি এসে উপস্থিত।

'হ্যাঁ দাদা ? সেই লোকটার নাম কী বলতো…সেই কমিডিয়ান ?'

'কে ?' ভাবনার মধ্যিখানে আমি হোঁচট খাই।

'সেই যে বাদামী রঙের বেঁটে মানুষটি চোখে চশমা…বিলিতি হাসির বইয়ে প্রায়ই যাকে দেখা যায়…'

'ড্যানি কেয়ীর কথা বলছিস ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই তো ড্যানি কেরীই তো। আশ্চর্য, তার নামটাই ভুলে গেলাম !'

'কিন্তু সে মোটেই বেঁটে নয়। বেশ লম্বা চেহারার। আর রঙও তার বাদামী না, তাছাড়া তার চশমাও নেই।'

'হ্যাঁ তা বটে।' বলল বিনি : 'তাহলেও তুমি তো বুঝেছ আমি

কাকে মীন করেছি।' তা বুঝেছি বটে, বিনির প্রত্যয়ের দ্বারাই বুঝেছি। এটাকে টেলিপ্যাথি বলতে পারো কিংবা অষ্ট বিভূতির কোন একটিও হতে পারে, যা কোন কষ্ট না করেই আমার আয়ত্তে এসে গেছে। আসলে এটা বিনির সাহচর্য। তার সঙ্গে বহু বিনিদ্র দিবসের বাক্যবিনিময়ের ফল।

'ড্যানি কেয়ীর একটা ছবি এসেছে মেট্রোয়, তার টিকিট কাটতে যাচ্ছিস বুঝি? তা যা। আমিও যেতাম, কিন্তু আমি একটা খুব জরুরী ঠিকানা নিয়ে পড়েছি···খোঁজ পাচ্ছিনে।'

'ঠিকানা, কার ঠিকানা গো? কিসের ঠিকানা?'

'এক উপমন্ত্রীর।'

'উপমন্ত্রী? তা, দমকলে খোঁজ করলেই পারো।'

'দমকল? দমকলে খোঁজ করতে বলছিস?' বিস্ময়ে আমার দম আটকায়ঃ 'তারা তো আগুন নেবায় রে? আমার মাথার আগুন কি নেভাতে পারবে তারা? ও বুঝেছি। তুই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে খবর নিতে বলছিস? তাই না?' আবার সেই বিনি প্রত্যয় কাজে লাগে। অকৃত্রিম এবং অব্যর্থ।

'তাই তো বলছি আমি। তা তো বলছি আমি। সেইখানেই তো পাঁচ বছর অন্তর অন্তর উপযুক্ত মন্ত্রীদের দম দিয়ে আবার চালু করে দেওয়া হয়।'

'তাই বল।' তারপরে আমি রাইটার্স বিল্ডিং নিয়ে পড়ি। বিনি চলে যায়। টেলিফোন করি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অনুসন্ধান বিভাগে।

'হ্যালো হ্যালো হ্যালো···'

'হ্যালো···কাকে চাই?' ললিত ললনা কণ্ঠের স্বর-লহরী শোনা গেল।

আমি উপমন্ত্রীর নাম বললাম।

'কে আপনি?'

'আমি? আমি শিবরাম চক্রবর্তী।'

'বরাম, না ব্রাম ?'

'সে কি ?' শুনে আমার চমক লাগে।

'তার মানে ?'

'মানে, আপনি শিবরাম না শিব্রাম ? উপমন্ত্রী মশাই এখন অফিসে নেই।'

'কোথায় গেছেন ? কখন আসবেন ?

'মাপ করবেন। মন্ত্রীদের গতিবিধির কথা জানাতে মানা আছে।'

'কী মুশকিল ! আমার যে ভীষণ দরকার তাঁকে। দয়া করে তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা বলুন তা'হলে। বাড়িতে নিরিবিলি পেলেই আমার সুবিধে আরো।'

'বাড়ির ঠিকানা ? অসম্ভব ! বাড়ির ঠিকানা আমি বলতে পারব না।'

'জানা নেই আপনার ?'

'জানি বই কি, কিন্তু বলা নিষেধ।'

এমন সময় পাশের ঘর থেকে বিনির আতঙ্কিত আর্তনাদ ভেসে আসে : 'দাদা, দাদা। ওমা, এ কী !' আওয়াজটা ছুটে এসে আমার টেলিফোন সূত্র ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

রিসিভার ফেলে ও ঘরে দৌড়ই।

'কী হয়েছে দ্যাখো তো একবার।' বিনি দেখায়।

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিনে। ঠিকই তো আছে।'

'কী নোংরা হয়েছে, ইস্। তেলচিটে পড়েছে গেছে সব। এমন নোংরা বিছানায় তুমি শোও কি করে গো ? কী নোংরা তুমি বাবা !'

'আমি মুখ বুজে খাই, চোখ বুজে শুয়ে পড়ি। চোখ খুলে ঘুমাইনে।'

'বলি নাক তো আছে ? টের পাও না নাকে ?' ব'লে বিনি উদাহরণ স্বরূপ হয়ে ওঠে, নাকে কাপড় চাপা দেয় : 'নাক ডাকিয়ে ঘুমোও ব'লে কি নাকে গন্ধ পাও না ? তোমার চাদরের গন্ধে যে ভূত পালায় গো।'

'ভূত পালাতে পারে।' আমি নিজেই সাফাই দিই: 'আমি তো এখনো ভূত হই নি। ভূত-পূর্ব অবস্থাতেই আছি।'

'যাও নিয়ে যাও।' চাদরটা গুটিয়ে আমার হাতে তুলে দেয় সে। 'নাও, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে রেখে দাওগে, আর সব ময়লা কাপড়ের সঙ্গে। ধোপা এসে নিয়ে যাবে এখন।' বলে সে বিছানায় ধোপদুরস্ত চাদর পাতে একটা।

বিনি কি বলতে চেয়েছে বুঝতে পারি। কিন্তু এবার আমার প্রজ্ঞা না খাটিয়ে ওর আজ্ঞামতই চলি, চাদরটা ধোপার ময়লা কাপড়ের ঝুপড়িতে না ফেলে আমার টেবিলের পাশে ফালতু কাগজের বালতিতে গুঁজে দিই। দেখবার মতন একখানা দৃশ্য হয় বটে।

টেলিফোন নিয়ে পড়ি আবার।

'হ্যালো···শুনুন। ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা আমার ভীষণ ভীষণ ভীষণ দরকার!' 'বঝলাম. কিন্তু বাধা আছে। অফিসিয়াল রেগুলেশনে বাধে।' 'আমাকে আন-অফিসিয়ালি বলতে পারেন না? লক্ষীটি। 'মাফ করবেন। নিষেধ অমান্য করতে পারব না।' 'তাহলে আর কী করে তাকে পাবো।' সখেদে আমি বলি।

'মিস্টার ব্রাম, কিছু মনে করবেন না। আমি আতশয় দুঃখিত'

'তা তো বুঝলাম।' ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে আওড়াই: 'আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য আমিও দুঃখিত কম নই। ক্ষমা করবেন আমাকে। তার ঠিকানা দেখছি পাবার কোনো উপায় নেই।' আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'দেখুন কিছু মনে করবেন না। আমাদের হাত-পা বাঁধা।' তিনি সুমধুর কণ্ঠে জানান: 'আপনি একবার টাইমটেবলটা উলটে দেখুন না। সেইখানেই তাঁর ঠিক ঠিকানা পেয়ে যাবেন।'

'টাইমটেবল!' শুনে আমি ঘাবড়ে যাই। 'মন্ত্রীবর কিছু মেল ট্রেন নন (এখন কি তিনি মেল হলেও) যে নম্বর ওনারি প্ল্যাটফর্মে তাঁর যাতায়াতের খবর পাবো। মেয়েটির এ হেন রসিকতা করার মানে?'

দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের সাধনায় রয়েছি, বিনি তার মাঝখানে এসে হানা দেয়—'এর মানে?' সে চেঁচিয়ে ওঠে: 'নোংরা চাদরটা তুমি এখানে এই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে গুঁজে রেখেছো যে?'

'তুই তো বললি। ওয়েস্ট পেপারের মধ্যে রাখতে বললি না?'

'চালাকি কোরো না। আমি যা বলেছি তুমি বেশ বুঝেছো ক বলেছি আমি?'

'বল-ই না। তুই বললে তবে তো আমি বুঝব।'

'আমি বলেছি বাজারের থলির মধ্যে রাখতে।'

'তা আমি পারব না।' সাফ বলে দিই! থলের ভেতরে ঐ ময়লা চাদর ঠেসে নিয়ে বাজারময় আমি ঘুরতে পারব না! তাহলে বাজার রাখব কার মধ্যে? না, তুই নিয়ে যা ওটা, তোর ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখ বরং।'

না, বিনি প্রত্যয়ের দ্বারা কিছুতেই আমি বুঝব না। বুঝতে চাইব না। চূড়ান্ত হয়েছে। এবার আমি মরিয়া। যেটি বলবে ঠিক সেইটেই করব আমি এখন থেকে। কথামতন কাজ।

কিন্তু উপমন্ত্রীর ঠিকানা?

মেয়েটি বললো রেলের টাইমটেবলের পাতা হাঁটকাতে…

ও, তাই। বিনি প্রত্যয় হঠাৎ এসে আমার মগজের মধ্যে ঘাই মারে। আমি ছাড়তে চাইলেও কমলি আমায় ছাড়ে না।

মেয়েটি টাইমটেবল দিয়ে কী বলতে চেয়েছিল আমি বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গেই উপমন্ত্রী মশায়ের বাড়ির হদিস আমি পেয়ে যাই।…

সব মেয়েই আমার সগোত্র। আমার বোনের মতই সুগভীর বন সব অরণ্যানী—এক কথায়!

যা বলতে চেয়েছিল মেয়েটা…টেলিফোন ডিরেক্টরীর মধ্যেই ঠিকানাটা পেয়ে গেলাম।

—ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ—

রেডিয়ো সর্বদাই রেডি!

সব সময়েই রেডি সে।

আর সেই কারণেই তার নাম নাকি রেডিয়ো।

কথাটা আমার নয়, শ্রীমান ধ্রুবেশ চন্দ্র অধিকারীর। এবং আজকের কথা না, তিন যুগ আগেকার!

কিশোর ধ্রুবেশ তখন ইস্কুলের ছাত্র। আমাদের পাড়ায় থাকত। তখনই সে এই বেশ কথাটি কয়েছিল আমায়।

একেলে রেডিয়োর এই গললগ্নীকৃত ট্রানজিস্টার রূপ তখনো দেখা দেয় নি। ছাদের মাথায় এরীয়েল খাটানো পাড়া-মাত-করা রেডিয়োয় কর্ণপাত করতে হোতো। সত্যি কইতে, কর্ণপাত করার রেডিয়োই ছিল বুঝি তখন। আগাগোড়া কর্ণবধ পালায় কুরুক্ষেত্রই ছিল রেডিয়ো।

এখন তো রেডিয়ো নব নব রূপে যত্রতত্র যখন তখন দেশকাল-পাত্র নির্বিশেষে গলায় গলায় দোললীলায়। পথে বিপথে পথিকদের সঙ্গে ঝুলন যাত্রার সহচর। কিন্তু সেকালের ছেলেটির কথাতেই একালীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বুঝি প্রচ্ছন্ন ছিল।

বালকের মুখে বিধাতা স্বয়ং বাক্যব্যয় করেন কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। তাদের বাতচিত একেকসময় বেশ ফলে যায়।

এখন তো তার ঘাড়ে ঘাড়ে বিলম্বিত অবলম্বনরূপ, ঘরে ঘরে সজ্জিত অলংকারস্বরূপ, বিবিধ ঘরানার সঙ্গমে সম্প্রচারিত ঝঙ্কাররূপ, দেশবিদেশের বিচিত্র স্বরলহরীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বিশ্বরূপ।

রেডিয়ো এখন সর্বজনের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার সেরা তুরুপ।

সুরাসুরের সংগীত সমুদ্র মন্থনের উচ্ছ্বসিত পরিশীলনের পরাকাষ্ঠা—আত্মপরিতৃপ্তির প্রতীক আভিজাত্য মর্যাদার সুলভ জনগণতান্ত্রিক সংস্করণ এই রেডিয়ো।

এখন সবার উপরে রেডিয়ো টেক্কা, তাহাকে ঠেকায় কেটা ?

ধ্রুবেশ এসে বলেছিল আমাকে, আর ত পারা যায় না দাদা! রেডিয়োর ডাকে পড়াশুনা তো ডকে উঠে গেল। বইয়ের পাতায় মন দেব যে তার যো নেই—পরীক্ষা পাস করব কি করে!

কেন কী হয়েছে!

পাশের বাড়ির রেডিয়োর জ্বালায় ত বাঁচা দায় হোলো দাদা! লেখাপড়া মাথায় উঠে গেছে আমার। দিনরাত খেয়ে না খেয়ে বাজিয়ে চলেছেন পড়শী ভদ্রলোক—সব সময়েই সেই একই উচ্চগ্রামে। মুহূর্তের জন্য থামেন না। কান ঝালাপালা হয়ে গেল মশাই!

পালাপালা ব্যাপার নাকি ?

প্রায় তাই। কিন্তু পালাই কোথায় ? পাগলের মত হতে হয়েছে, বলব কি! একটা উপায় তো বাতলান দাদা।

পাগল হয়ে যাও! একটা উপায় আমি বাতলাই।

ওটা কোনো কাজের কথাই নয়। ঘাড় নাড়ে সে—পাগল হতে কি কারু ভালো লাগে কখনো ? হতে চায় কেউ ?

ভালো লেগে কি কেউ পাগল হয় নাকি ? তবে ভালোবেসে কেউ কেউ পাগল হয়ে থাকে বলে শোনা আছে।

রেডিয়োকে কি কেউ ভালোবাসতে পারে কখনো ? সে জানতে চায়—যতই দেখতে ভালো হোক না, ভালোবাসার কি ও ? যে ওর জন্যে পাগল হতে যাব হঠাৎ ?

তা জানিয়ে, তবে জানি যে অযোগ্যরাই চিরদিন ভালোবাসা পেয়ে থাকে। যা কিছু বা যাদের আমরা ভালোবাসি তারা কেউই, ভেবে দেখলে, আমাদের ভালোবাসার যোগ্য নয়···শুধু অযোগ্যরাই ভালো-বাসা পায়।

পরের রেডিয়োকে ভালোবেসে আমি পাগল হতে পারব না।

পাগল হলে তুমি বেঁচে যেতে ভাই! ওই তোমার বাঁচবার একমাত্র উপায় ছিল। নিশ্চিন্ত হতে পারতে একেবারে। পড়াশুনা করতে হত না, পরীক্ষার ভাবনা চিন্তা সব চলে যেত একদম।

তবুও সে ঘাড় নাড়তে থাকে। এভাবে নির্ভাবনা হতে সে নারাজ। তার মতে, ভালোবাসার পক্ষে পরের মেয়ে প্রশস্ত হলেও, পরের রেডিয়ো নাকি সে-বস্তু নয়। একেবারে বিচ্ছিরি।

তার কথাটা হয়ত নেহাত অর্বাচীন নয় কিন্তু রেডিয়োর কথাই হচ্ছে·········

একেবারে ব্রহ্মসূত্রের মূল কথা। এক আমি বহু হব। বহুল হয়ে পরস্পরকে হুল ফোটাব—তার সেই হুলবিদ্ধিতে হুলুস্থুল যাই হোক না, তাতেই আমার আনন্দ। আর, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি—ইত্যাদি ইত্যাদি!

সংগীতের সার কথা তার মধ্যেই নিহিত। চিরদিন সে তার সঙ্গী খোঁজে। সংগত (নাকি, সংগম?) না হলে তার চলে না এবং সেটা কিছু অসংগত নয়।

শ্রোতা তার চাই। সুরধুনির খরস্রোতা চিরদিনই উৎকর্ণ ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছি।

সুর হচ্ছে প্রায় শুঁড়ের মতই এক অনুনাসিক কাণ্ড! হাতির গোদা গোদা হাত থাকলেও, ভদ্রলোকের মতন, হাত বাড়িয়ে পরের কান পাকড়াতে তার বাধে—তার ওপর যতই কেন রাগ থাক না। তাই সে শুঁড় বাড়িয়ে কানের জন্যে সাধে।

ভদ্রলোকেরও হাতির মত হাতাহাতি করতে আটকায়। তাই পড়শীর কর্ণমর্দনের সদিচ্ছাবশেই সে এক সংগ্রামী রেডিয়ো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে।

পাশের বাড়ির মেয়েটি হারমোনিয়ম নিয়ে যখনই গান ধরেছে আমার মনে হয়েছে যে তার এই স্বরলহরী পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী ছেলেটির

জন্যেই। হাত বাড়িয়ে তার কান নাগালে পাচ্ছে না বলেই এই সুর বাড়ানো—সুর বাড়িয়ে তার কান পাকড়ানো। এবং কান টানলেই তো মাথা এসে যায়। আর মাথার সঙ্গে আপাদমস্তক।

মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা! নাসিক শহরের এই উন্নাসিক প্রয়াস কর্ণাট অঞ্চলের অনাবাদী জমি আকর্ষণ করে সোনা ফলানোর। সোনা যেমন লঙ্কার সংগীত তেমনি অলংকার। সুরের ঝাল দিয়ে বানানো। সোনার ঝালমরা বাদ দিয়ে যেমন সেই গহনা (কিংবা গহনা) যার জন্য নাকি বানি লাগে। সেই বাণী শোনার মতই নয় কি এবং শোনানোর মতও পিশচয়ই। ফলতঃ তারই রূপান্তর এই রেডিয়ো।

বিসমিল্লার দয়ার এক রেডিয়ো দশাননের ন্যায় বিংশতি বাহু বিস্তার করে বিশ জোড়া কান মলতে চায়। আর খোদার কুদরতে, কানাড়া প্রদেশের এই কাড়ানাকড়ায় কালারাই—শুধু বাঁচতে পায়। তারাই একমাত্র সুখী। কানের খোল মজবুত করতে নাসিকার ঢোল শহরত তাদের দো-কানে এসে হার মানে। যারা কানে খাটো তাদের কাছে আদৌ কোন কের্দানি খাটে না।

কিন্তু এই সব তত্ত্বকথা সে বুঝতে নারাজ। সে বলে—না দাদা, আজ একটা এস্‌পার ওস্‌পার করব রেডিয়োটার। আজ রাত্তিরে সবাই ঘুমুলে পর আমাদের ছাদ টপকে ওদের ছাতে গিয়ে এরীয়েলটা কেটে দিয়ে আসব আমি।

কী সর্বনাশ! শুনেই আমি আঁতকে উঠেছি—টপকাতে গিয়ে বেটপকা পড়ে যাও যদি নীচে?

আমাদের ছাতে ওদের ছাতে গায়ে গায়ে লাগানো। লম্প ঝম্প করতে হবে না আমাকে—পড়বার ভয় নেই দাদা!

এরীয়েলের ওই সব তার কাটা-কাটির ভেতর না গিয়ে মা-বাবাকে বলে দেখ না কেন, যদি তাঁরা এর কোনো বিহিত করতে পারেন?

আমি বলি—তাঁরা পড়শী কর্তা বা গিন্নীকে বলুন না যে তাঁদের ছেলের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে?

রেডিয়োর জন্যে বেশ খুশীই আছেন মা। রাত দিন ভালোমন্দ গান শুনতে পাচ্ছেন বিনিপয়সায়···। সর্বদা তাঁর কানা খাড়া।

আর বাবা?

পাগলের মতন হয়ে গেছেন। আমার মতই দশা প্রায়। একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারেন না বাড়িতে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান কেবল। দিনরাত বাইরে বাইরেই কাটাচ্ছেন। সেই যা খাবার আর শোবার সময়টায় আসেন বাড়ি।

পাগল হয়ে যাবেন নাকি শেষ পর্যন্ত?

কী করে বলব? পাগল হয়ে গেলে কী হবে কে জানে! কী-যে করে বসবেন কেউ বলতে পারে না।

তারপর তো ধ্রুবেশ বাড়ি চলে গেল। পরের কাহিনীটা প্রকাশ করি এবার—

সারা রাত চোখে ঘুম নেই বেচারার। বাড়ির সবাই না ঘুমুলে ছাদে যায় কি করে? কি করেই বা এরীয়েলটাকে সরাইখানায় পাঠায়? অবশেষে রাত আড়াইটার পর বাড়ির সবার নাক ডাকতে শুরু হলে সে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক কাঁচি নিয়ে এরীয়েলটা কেটে দিয়ে এসেছে শেষ মেশ।

তারপরেও উত্তেজনায় অনেকক্ষণ তার ঘুম আসে নি। ভোর বেলাটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

রাতারাতি এই ছাতাছাতি কাণ্ডর পর অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙলো তার—আর, ঘুমটা ভাঙলো সেই আবার রেডিয়োর আর্ত-নাদেই।

অ্যাঁ? একি! রেডিয়োটা বাজছে আবার যে? এলো কোথা থেকে ফের? সে তো তার সপিণ্ডকরণ সেরে এসেছে কাল রাত্রেই। তবে?

আওয়াজটা যেন কাছিয়ে এসেছে আরো এবার। বাজছে যেন একেবারে তার কানের গোড়াতেই।

ভালো করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে ঠাওর পায়—ওমা! তাই তো! রেডিয়োই ত! ঝকঝকে একটা রেডিয়ো তারই পড়ার টেবিলের ওপরে বসানো—তার পাশটিতেই।

সেই যন্ত্র! আর সেই যন্ত্রণা!! আবার আনকোরা আমদানি!

বাবা আজ সাত সকালে উঠে নতুন এক রেডিয়ো কিনে এনেছেন বাড়িতে।

আট সকালে এরীয়েল খাটিয়েছেন ছাতে গিয়ে। আর, এখন সাড়ে আট সকালের থেকে এই ষাঁড়ের আওয়াজ শুরু!

এ কী বাবা! এ কী কাণ্ড! চমকিত হয়ে শুধিয়েছে সে।

বাড়িতে রেডিয়ো না থাকলে কি মানায় রে খোকা! তিনি বলেছেন—রেডিয়ো একালের স্ট্যাটাস সীমবল। বাড়ীতে না রাখলে প্রেসটিজ যায়, সব বড় লোকের বাড়িতেই রেডিয়ো দেখবি, এমনকি মেজ লোকদের বাড়িতেও। যাদের বাড়ি তা নেই বুঝবি তারা নিতান্ত ছোটলোক।

প্রেসটিজ রাখতে যে প্রাণ যায় বাবা! প্রাণ আর কান দুই যায় যে!

আমি ভাবছি ফি মাসে, মাসকাবারে একটা করে নতুন রেডিয়ো কিনে আনব, অন্য এক আলাদা মডলের, বুঝলি খোকা? আমাদের প্রত্যেক ঘরে একটা করে রেডিয়ো শোভা পাবে। ফি ঘর একটা করে হলে আরো কতো প্রেসটিজ বাড়বে ভেবে গ্যাখ দেখি।

ধ্রুবেশ ভেবে দেখার চেষ্টা করেছে।

পাড়ার সবাইকে, বিশেষ করে পাশের বাড়ির অভদ্রটাকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই – শুধু দেখিয়ে নয় শুনিয়েও দিতে চাই দস্তুর মতন। বছরখানেক বাদে যখন একসঙ্গে আমাদের বারোটা রেডিয়ো বাজবে···

সেই বাড়াবাড়ির স্বপ্নে তিনি মশগুল! —রেডিয়োর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব!

রক্ষে করো বাবা! সব রেডিয়োতে তো সেই একই আওয়াজ ছাড়বে। একই গান বাজবে ত!

বাজলই বা! তাতে কি! সব বুলবুলিরই তো একরকমের বুলি! তাই বলে কি লোকে এক ঝাঁক বুলবুলি পোষে না?

জবাব দিতে ধ্রুবেশের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়।

তাছাড়া সব কটাতে একরকমের বাজাবোই বা কেন? আমরা তো ইচ্ছে করলে একটায় কলকাতা, একটায় কাশ্মীর, আরেকটায় কামসকাটকা ধরতে পারি। কোনটায় মার্কিন, কোনটায় কানাডা, কোনোটাতে জাপানী গান বাজবে আমাদের। একটায় চীন, একটায় কোচিন আরেকটায় ইন্দোচীন বাজলে কী হয়? কোনো ক্ষতি আছে?

না, ভেবে দেখলে, গানের এই বৃদ্ধিবাহুল্যে কোনো ক্ষতি নেই — কানের ক্ষতিবৃদ্ধি যাই হোক না। খসিয়ে দেখেছে ধ্রুবেশ।

আমাকে এসে বলেছে—রেডিয়ো বলে কেন, জানো দাদা? সব সময়েই সে রেডি। সেই কারণেই রেডিয়ো।

ধ্রুবেশের কথায় রেডিয়োর মর্ম বুঝতে পারি নি তখন, এখন সেটা বুঝেছি। তখন তার মর্মভেদ করতে পারি নি, এখন বুঝছি সেটা কী পরিমাণ মর্মভেদী। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি বেশ। আহারে বিহারে সর্বক্ষণ।

সুরব্রহ্মের অনুমাত্র নয় আর—এখন তার আণবিক বিস্ফোরণে আসুরিক মাত্রার একাকার।

আনরা বাসার চার পাশেই, ওপর তলায়, নীচুতলায়। এ-ঘরে, ও-ঘরে, সে-ঘরে, এ পাশের বাড়ি ও পাশের বাড়িতে কোথাও হিন্দ গানা, কোথাও গুজরাটি বাহানা, কোথাও অসমীয়া সংগীত, কোথাও বাংলা আধুনিক, কোনোখানে তামিলী নাড়ু, কোথাও কানাড়া-কারু— কতই না কেরামতি! কারো বা আবার পাকিস্তানী কাবাব। কেউ

ধরেছেন চীন, কেউ বা মার্কিন, কেউ লনডন, কেউ আবার ভয়েস অব আমেরিকা। গানে গানে ছয়লাপ। সুরে অসুরে নয় ছয়! পরস্পরকে টেক্কা মারতে সকলেই তাঁর রেডিয়ো প্রোগ্রাম হাজার গ্রাম বাড়িয়ে একেবারে কিলোমিটারে সাধতে লেগেছেন।

আর সেই কিল খেতে হচ্ছে সকাল সন্ধ্যে—এই আমাকেই।

কে যেন বলেছিল, রেডিয়ো আনন্দলাভের উত্তম মধ্যম, শুধু নিছক একটা যন্ত্র না।

আমিও সেই কথাই কই—রেডিয়ো এক নিছক যন্ত্রণা। পাড়া পড়শীর ওপরে গায়ের ঝাল মিটিয়ে রাগের ঝাল ঝাড়বার, কান ধরে পেটাবার—পিটিয়ে আনন্দলাভের এই এক উত্তম মধ্যম! প্রহরে প্রহরে অহরহ সেই প্রহার—প্রাণে না মেরে এক নাগাড়ে তাদের কানে মারো।

পঞ্চশরে ভস্ম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী একদা যে কাণ্ড বাধিয়েছিলেন, সপ্ত স্বরে বশ্য করে অদৃশ্য ইথররঙের ভিতর দিয়ে বিতরণে ভোলানাথের এ আরেক মহামারি আমোদ।

রেডিয়োর ঠেলায় ধ্রুবেশের লেখা পড়া শিকেয় উঠেছিল, আমার বেলায় লেখা পড়া অসম্ভব। আর, মনের ডিমকে তা দিয়ে কাগজের পাতায় না পাড়তে পারলে···বলুন ত আমার কী সর্বনাশ···এই ঘোড়ার ডিমের লেখা বেচেই তো খেতে হয় আমাকে? লেখার মোট নামিয়ে তবেই না মোটের ওপর আমার মেহনতি মজুরি!

এরীয়েলের সহায়তায় সেকালের সেই একাঘ্নী এখন ট্রানজিসটারের সংক্রামকতায় সহস্রমারী পাশুপত! এই শক্তিশেল কে সামলায়!

সেদিনের সেই এরীয়েল আর নেই বটে, কিন্তু শেলী ঠিকই রয়েছেন। শেলীরা অমর।